দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩।। ১ পৌষ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
মানব জাতির জীবনদর্শন

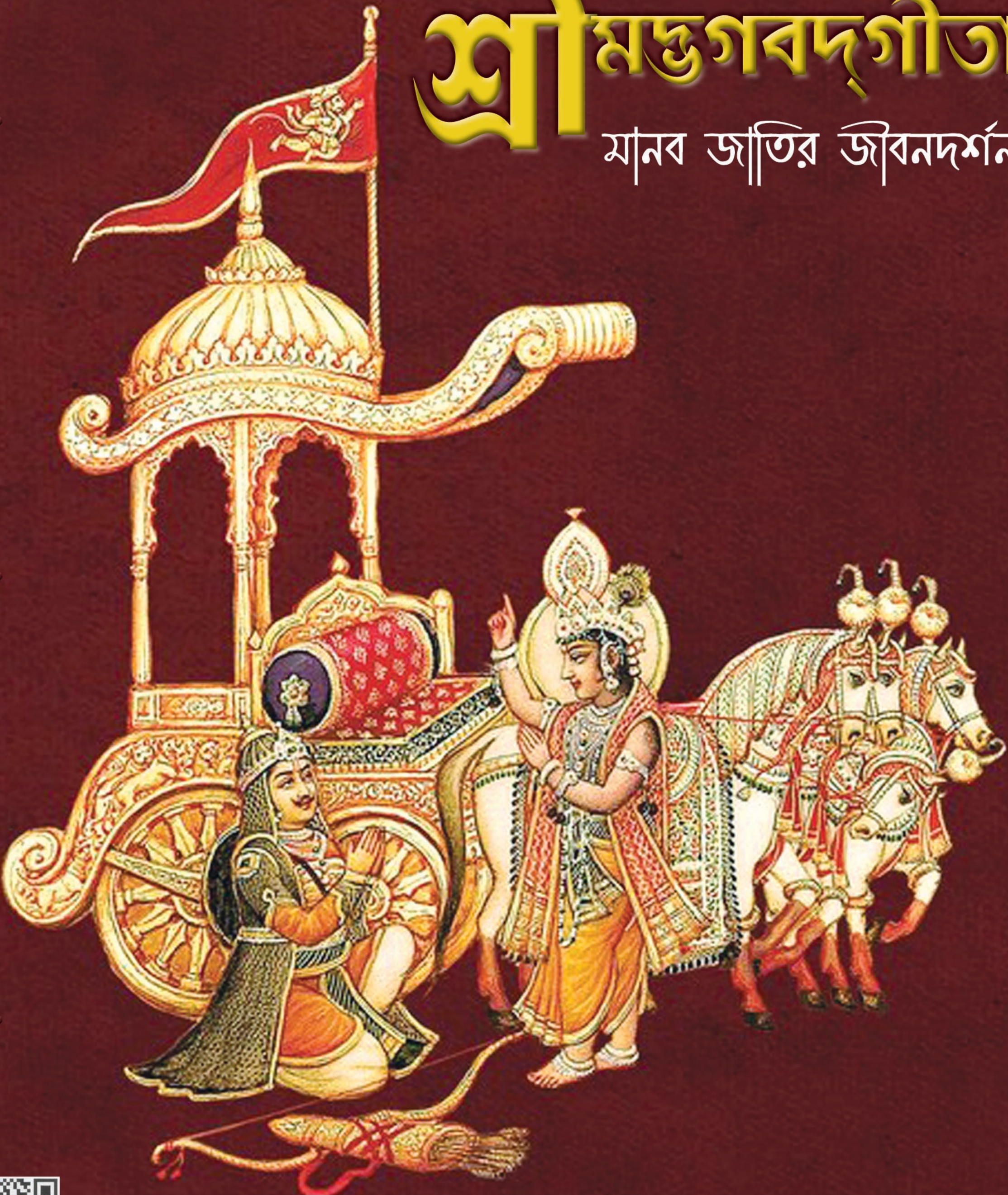

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৮ ডিসেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

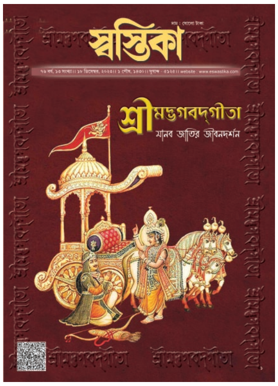

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

১৯৫১-র পর থেকে মোট ১৬ সাংসদ বহিষ্কৃত, কতটা নির্লজ্জ হলে... ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

আসল পেলে কেউ ভেজাল নেয়? ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

'হিন্দু' কোনো 'মতবাদ' নয় ◻ কে এ বদরীনাথ ◻ ৮

ভারতীয় প্রযুক্তিতে সজ্জিত হচ্ছে দেশের বায়ুসেনা ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

ধর্ম্য সংগ্রাম—গীতার সরলতম উপদেশ ◻ ড. রাকেশ দাশ ◻ ১১

সনাতন ধর্মের প্রতি কিছু রাজনীতির কারবারিদের এত আক্রোশ কেন? ◻ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ১৩

পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল জানান দিল আসন্ন লোকসভা ভোটের ফল কী হতে চলেছে ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৬

ভারতবাসীর বিশ্বাস আর ভরসার নাম নরেন্দ্র মোদী ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ১৮

হরে কৃষ্ণ হরে হরে গীতাপাঠ ঘরে ঘরে ◻ শ্রীপাদ জগদার্তিহা দাস ◻ ২৩

শ্রীঅরবিন্দের গীতা অনুধ্যান ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৪

গীতাপাঠ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ : একটি অসত্যের অপনোদন ◻ ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায় ◻ ২৯

নবান্ন উৎসব ও বাঙ্গলার কৃষিকৃষ্টি ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ৩১

হুগলী জেলার বরেণ্য সন্তান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ◻ বিনয় মণ্ডল ◻ ৩৩

সাক্ষাৎকার : গীতা ধর্মের চেয়ে বেশি জীবনের কথা বলে, তাই গীতা বিশ্বমানবতার জীবনদর্শন—স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ ◻ ৩৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শুধু ধর্মশাস্ত্র নয়, এক বিশ্বজনীন সাহিত্য ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৩৮

রাসায়নিক সার মন্থর বিষ— জৈব কৃষির কোনো বিকল্প নেই ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ৪৩

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয় জাগরণ ◻ অভিজিৎ ভট্টাচার্য ◻ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৪৮-৪৯ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৫ ডিসেম্বর,
২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জননেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী

অটলবিহারী বাজপেয়ী— একজন স্বয়ংসেবক থেকে সফল রাজনীতিক হিসেবে উত্তরণ। নিঃস্বার্থ সমাজসেবী, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, প্রখর বক্তা, কবি, সাংবাদিক তথা বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের উন্নয়ন, গরিব মানুষের কল্যাণ এবং সুশাসনের নতুন যুগের পথপ্রদর্শক।

২৫ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাঁর জীবনী ও অনেক অজানা তথ্য নিয়ে আলোচনা করবেন শিলাদিত্য ঘোষ, শেখর সেনগুপ্ত, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, অমিত চৌধুরী প্রমুখ।

প্রকাশিত হবে
২৫ ডিসেম্বর,
২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতের জাতীয় গ্রন্থ

শ্রীগীতা এক মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থ শুধু ভারতবর্ষের নহে সমগ্র মনুষ্যজাতির জীবনদর্শন। এই মহাগ্রন্থ ভারতবর্ষই বিশ্বকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাবীর অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশ হইলেও ইহা সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি উপদেশ। এই গ্রন্থ হইতে একজন কর্মী কর্মযোগের প্রেরণা লাভ করেন, জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানযোগের প্রেরণা লাভ করেন, ভক্তজন লাভ করেন নিস্বার্থ ভক্তির প্রেরণা, একজন সৈনিক লাভ করেন যুদ্ধক্ষেত্রেও ধৈর্যশীল থাকিবার মন্ত্র। তাই গীতা শুধু ধর্মগ্রন্থ নহে, জীবনগ্রন্থও বটে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী হাজার হাজার বৎসর ব্যতীত হইবার পরেও সমান প্রাসঙ্গিক শুধু নহে, তাহার গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। মহাকাব্য মহাভারতের অংশ হইলেও গীতা ভারত তথা বিশ্ববাসীর নিকট এক পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। ভারতীয় মনীষীদের ন্যায় বিশ্বের বহু মনীষী এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। আমেরিকান পদার্থবিদ তথা পরমাণুবোমার জনক রবার্ট ওপেনহাইমারও গীতার উল্লেখ করিয়াছেন। বলা হইয়া থাকে, ১৯৪৫ সালে প্রথম পরমাণুবোমার পরীক্ষা সফল হইবার পরে তিনি গীতার একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ ও দ্বাত্রিংশ সংখ্যক শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আধুনিককালের ভারতীয় সন্ন্যাসী শিরোমণি স্বামী বিবেকানন্দ গীতাকে জীবন সংগ্রামের এক অপূর্ব পাথেয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেশে বিদেশের বহু স্থানে তিনি গীতা অনুধ্যান বিষয়ে বক্তব্য রাখিয়াছেন। আত্মিক শক্তিলাভের জন্য তিনি যুবকদিগকে গীতাপাঠের উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ গীতাকে ডিভাইন টিচার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আজ সমগ্র বিশ্বে যে সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক হানাহানির পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, গীতাজ্ঞানই তাহা প্রশমিত করিতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

গীতা সংস্কৃত গ্রন্থ হইলেও ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে তাহার পঠনপাঠন অনায়াস করিবার জন্য সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। লোকমান্য তিলক মরাঠি ভাষায় গীতাজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কালজয়ী গ্রন্থ গীতারহস্য দেশ বিদেশে সমাদৃত। বাংলাভাষায় জগদীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত গীতা, কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যগীতা, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থের পদ্যগীতা বাঙ্গালির ঘরে ঘরে রহিয়াছে। বিদেশে গীতা প্রচারের উল্লেখযোগ্য কাজটি করিতেছে শ্রীল অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘ। ভারতেবর্ষে গীতা প্রচারের সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করিতেছে গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর। ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষায় অনূদিত গীতা ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহারা ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে। এই কার্যের নিমিত্ত তাহারা ভারত সরকার কর্তৃক গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছে।

হিংসা দ্বেষে দীর্ণ মনুষ্যজাতির প্রতি মহাগ্রন্থ গীতায় সাবধানবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। তাহা হইল কাম, ক্রোধ ও লোভ— এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ এবং আত্মার হননকারী অর্থাৎ আত্মাকে অধোগামী করে। তাই এই তিনটিকে বিষবৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এই সাবধানবাণী সত্ত্বেও মানুষ কাম-ক্রোধ-লোভে মত্ত রহিয়াছে। গীতাকে মানুষের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একসময় লোকসভায় সাংসদ সুষমা স্বরাজ গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ ঘোষণা করিবার প্রস্তাব রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, গীতা তো প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় গ্রন্থই, শুধু ঘোষণাটি বাকি রহিয়াছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে জি ভি আইয়ার পরিচালিত সংস্কৃত চলচ্চিত্র 'ভগবদ গীতা' শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হইয়াছে। বস্তুত, ভারতবর্ষের পরিচিতি হইল গীতা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফরে যাইয়া বারাক ওবামার হস্তে গীতা উপহারস্বরূপ দিয়াছিলেন। ভারতে আগত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের হস্তেও তিনি উপহার স্বরূপ গীতা তুলিয়া দিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় সাধু সন্ন্যাসীরা মনে করিতেছেন, গীতার আরও ব্যাপক প্রচার-প্রসারের প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গের সাধু সন্ন্যাসীরা কলকাতায় লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করিয়াছেন। হিংসায় দীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে ইহা যে সুচিন্তিত ও সমযোপযোগী পদক্ষেপ তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

সুভাষিতম্

কঃ কালঃ কানি মিত্রাণি কো দেশঃ কো ব্যয়াগমৌ।
কশ্চাহম্ কা চ মে শক্তিঃ ইতি চিন্ত্যম্ মুহুর্মুহুঃ।। (চাণক্যনীতি)

কী রকম পরিস্থিতি, কে আমার বন্ধু, আমি কোথায় রয়েছি, আমার আয়-ব্যয় কত, আমি কে আর আমার কত ক্ষমতা --- এই বিষয়ে বারবার চিন্তা করা প্রয়োজন।

১৯৫১-র পর থেকে মোট ১৬ সাংসদ বহিষ্কৃত

কতটা নির্লজ্জ হলে...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কতটা নির্লজ্জ হলে 'তৃণমূল' বলা যায়। সংসদ-সহ জাতীয় স্বার্থকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে সংসদ থেকে যথার্থভাবেই বহিষ্কার করা হয়েছে। ১৯৫১-র পর থেকে এই নিয়ে ১৬ জন সাংসদ বহিষ্কৃত হলেন। তার মধ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী (১৯৭৮ ডিসেম্বর, ক্ষমতার অপব্যবহার), সুব্রহ্মণ্যম স্বামী (১৯৭৬, অশোভন আচরণ), শিল্পপতি বিজয় মাল্য (ব্যাংক জালিয়াতি আর ঋণ খেলাপি) আর রাহুল গান্ধী (প্রধানমন্ত্রীর পদের অবমাননা। তবে আপাতত তিনি আদালতের স্থগিতাদেশে তা ফিরে পেয়েছেন)। রয়েছেন ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ১৯৫১ সালে সংসদ থেকে প্রথম বহিষ্কৃত কর্ণাটক হুবলির হুচেশ্বর গুরুসিধা মুদগল। একই অভিযোগে ২০০৫ সাল ১১ জন সাংসদকে বহিষ্কার করা হয়। তবে মহুয়া মৈত্রকে যে কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে তার চাইতে নজিরবিহীন আর লজ্জার ইতিহাস সংসদে নেই।

একজন সাংসদের প্রাথমিক সততা তার দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সংসদের মর্যাদা আর এলাকায় সম্পৃক্ত। মহুয়া তা ইচ্ছা করে ভেঙেছেন। আর চোরের মায়ের বড়ো গলা করে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সংসদের আলোচনা বা প্রশ্ন করার জন্য প্রতিটি সাংসদের গোপন চাবিকাঠি থাকে। তাকে বলে লগ-ইনআইডি ও পাসওয়ার্ড। সংসদে প্রশ্ন তুলতে গেলে সেই চাবিকাঠি ব্যবহার করে তা করতে হয়। সে চাবি কেবল ওই সাংসদ আর সংসদের সম্পত্তি। অন্য কারও সঙ্গে তা ভাগ করা যায় না। করলে তা দেশবিরোধী অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আর মহুয়া ঠিক তাই করেছেন। ফলে সংসদ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পাশাপাশি সিবিআইকে নিজের ঘরে ডেকে এনেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে।

যে অন্যায় মহুয়া করেছেন আমার ধারণা তাঁর জেল না হলে এই দেশের অকল্যাণ হবে। তা নিদর্শন হয়ে থাকবে। তাই এই ধরনের দেশ ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী ব্যক্তিদের কেবল সংসদ নয়, দেশ থেকেও নির্বাসন দেওয়ার উপায় থাকলে সেটাই করা উচিত। এক উটকো শিল্পপতি বন্ধুকে মহুয়া সংসদের প্রশ্নোত্তরের সেই চাবি দিয়েছিলেন। আমি এটাকে এক ধরনের চৌর্যবৃত্তি বলব। মহুয়ার সেই উটকো বন্ধু বিশ্বের চার জায়গা থেকে ৪৭ বার ওই চাবি ব্যবহার করেছে নিজের শিল্পস্বার্থে। আর মহুয়া তার সঙ্গী হয়ে ২০১৯-এর ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংসদে ৫১টি প্রশ্ন করে বাজার গরম করেছেন। অন্যের লিখে দেওয়া প্রশ্ন অন্ধের মতো আউড়ে গিয়েছেন।

কারণ, মহুয়ার ধার করা মস্তিষ্ক। নিজের ভাঁড়ার শূন্য। মজার ব্যাপার, তাঁর কোনো প্রশ্নের সঙ্গেই রাজনীতি বা তার এলাকার স্বার্থ জড়িত নয়। কেবল শিল্পপতিটির শিল্পস্বার্থ জড়িত। তবে বিনিময়ে ওই শিল্পপতিটির কাছ থেকে মহুয়া বেশ মোটা উপহারের দাঁও মেরেছেন। কাটমানিও নাকি নিয়েছেন। তৃণমূলের যা সংস্কৃতি তাতে দল যে মহুয়ার পাশে দাঁড়াবে সেটাই স্বাভাবিক। তৃণমূলের চার হিপোপটেমাস নেতা আর মন্ত্রী জেলে রয়েছেন। খুব শীঘ্র আরও দু'জন যাবেন। শোনা যাচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাকি সেই লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাই মহুয়া এই চোর সঙ্গমের বাইরে থাকবেন এটা আশা করাই বোকামি।

> **প্রতিশোধ নিতে মহুয়ার অন্তঃসার শূন্য আস্ফালন আর মহুয়ার জন্য মমতার ফাঁকা বুলি মিশে গিয়ে রাজ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে বলাই চলে 'কতটা নির্লজ্জ হলে মহুয়া হওয়া যায়'।**

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাত বারের সাংসদ। সেখানে তিনি বহু নাটক করেছেন। অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে তহলকা ঘুষ কাণ্ডে মন্ত্রিত্ব ছাড়ার নাটক পর্যন্ত। তাই মহুয়ার বেয়াদপিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন। তবে পুরোটা মেনেছেন কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। ২০১৩-র পর থেকে মমতা তৃণমূলকে চোরের দল বানিয়ে ফেলেছেন। তাই বিরোধীরা তাঁকে 'চোরের রানি' বলে ডাকে। চোরের পাশাপাশি তৃণমূলের মহুয়ার ওপর এবার জাতীয়তা বিরোধী অভিযোগ আসতে চলেছে। মমতা তা সামলাতে পারবেন না। মহুয়াকে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে প্রার্থী করা হবে বলে মমতা যে আওয়াজ তুলেছে তা ফাঁকা বুলি বলেই মনে হয়।

প্রতিশোধ নিতে মহুয়ার অন্তঃসার শূন্য আস্ফালন আর মহুয়ার জন্য মমতার ফাঁকা বুলি মিশে গিয়ে রাজ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে বলাই চলে 'কতটা নির্লজ্জ হলে মহুয়া হওয়া যায়'। রাজ্যের মানুষ তা বিচার করবেন। তবে মহুয়াদের মতো অসাধু সাংসদদের বোঝা উচিত সংসদটা তাদের মাতুলালয় নয় যে সেখানে যা ইচ্ছা তাই করা চলে।

(মতামত ব্যক্তিগত)

আসল পেলে কেউ ভেজাল নেয়?

সনাতনবিরোধীষু দিদি,

আপনার জোট ইন্ডিয়া বৈঠক ডেকেছিল। কিন্তু আপনি যাননি। রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল কংগ্রেস। দিদি আপনি যাননি। ঠিক করেছেন। মামাবাড়ির আবদার নাকি যে শেষবেলায় হঠাৎ করে ডাকলেই যেতে হবে? আপনার পরিবার নেই আপনি বলেন। আমিও সেটা মানি। কিন্তু ভাইপো তো আছে। এক ভাইপো রাজনীতিতে এসে বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছেন। চেয়ার ধরে টানাটানি করছে। তাই বলে কি আর এক ভাইপোর বিয়েতে যেতে নেই? সরকারি ব্যবস্থায় বিয়ের আয়োজন করেছেন। ঠিক করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ে মানে তো রাজ্য সরকারেরই কর্মসূচি। তাতে রাজ্যবাসীর নিমন্ত্রণ না থাকলেও করের টাকায় উপহার দেওয়া বাধ্যতামূলক।

এই রে! আমি ধান ভাঙতে বসে শিবের গীত গাইতে লেগেছি। আমি আসলে আজ একটা কথা জানতে চাই, আপনি কি আদৌ জোটে আছেন, নাকি ঘোঁট পাকিয়ে জোট ভেঙে দেওয়াই মতলব? রাজ্যবাসী বুঝতে পারছে না। শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই আপনি কংগ্রেসকে রাজ্যে তিনটি আসন ছেড়ে দেবেন বলেছেন। তার মধ্যে দু'টি অতীতে কংগ্রেসের জেতা আর একটি বিজেপির। কিন্তু কোন কংগ্রেস? মানে আপনাদের জেটের মেরুদণ্ড কংগ্রেস তো ইতিমধ্যেই লোকসভা ভোটের বার্তা পেয়ে গিয়েছে।

কারণ, কংগ্রেসের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য বিজেপির কাছে দাক্ষিণাত্য আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়, উত্তর ভারতের ভোটেই নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে তৃতীয়বার সরকার গঠন সম্ভব। আর দক্ষিণেও বিজেপি নেই তা তো নয়। হতে পারে কর্ণাটকে বিরোধীর আসনে, কিন্তু রয়েছে। আর লোকসভা নির্বাচন হবে মোদীর দিকে তাকিয়ে। তেলেঙ্গানাতেও বিজেপি আদৌ হারেনি, বরং রাজ্যে কার্যত অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে তাদের বিধায়কের সংখ্যা ও প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত বেড়েছে। মধ্যপ্রদেশে কমলনাথ যে ভাবে দলীয় সহকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষ উগরে দিয়েছেন, রাজস্থানে অশোক গহলৌত আর সচিন পাইলট যে ভাবে একে এপরের বিরোধিতা করেছিলেন, তা ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং মজবুত ও সুসংহত বিজেপির প্রতি ভালোবাসা বাড়িয়েছে। স্বয়ং রাহুল গান্ধী এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে মাথা ঠুকেও মোদীর জনপ্রিয়তায় টোল ফেলতে পারেননি? প্রতি আসলে ওই দুই রাজ্যের হিন্দুত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবানরা বুঝেছেন কোনটা আসল ভক্তি আর কোনটা ভেজাল। আসল পেলে কে আর ভেজালে আকৃষ্ট হয় বলুন?

> আপনি এখন মোদীজীর দর্শন পাওয়ার জন্য মরিয়া। যান, দর্শন করুন। কথা বলুন। তবে দিদি আগে থেকেই বলে রাখছি তিনি কিন্তু কঠিন প্রকৃতির মানুষ। আপনি ভাইদের দিয়ে যে দুর্নীতি করিয়েছেন তার প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত রেহাই নেই।

'ইন্ডিয়া জোটেও স্বভাবতই প্রশ্নগুলি উঠছে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানতে কার্যত সব শরিকেরই কম-বেশি আপত্তি ছিল। সবচেয়ে বেশি ছিল দিদি আপনার। এখন মনে হয় একেবারেই মোহভঙ্গ হয়েছে। বিজেপি কিন্তু নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল। জি-২০-র পরে দেশের মানুষের মনে নরেন্দ্র মোদীর 'বিশ্বনেতা' ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জানুয়ারিতে রামমন্দিরের উদ্বোধন। তার আগে ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ। মোদী আসছেন। আপনি আবার বাগড়া দিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা টেটের দিন বদলে গীতাপাঠের দিনে ফেলেছেন। তাতে হিন্দুরা কি খুশি হবে? দুধেল গাইদের কথা আমি বলতে পারব না। তবে একটা কথা দিদি বলে রাখি, আপনার ভাইদের কেউ কেউ এখন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছেন। কেউ কেউ গীতাপাঠও করছেন। আবার কয়েকজন গীতাপাঠের পালটা কলকাতায় চণ্ডীপাঠের আয়োজন করতে চান।

দিদি আপনাকে বলতে হবে ভাবিনি, তবু বলছি দিদি, আসল পেলে কেউ ভেজালের দিকে যায় না। তাই আপনি ভুল উচ্চারণে যতই মন্ত্র আওড়ান সবাই আপনাকে কিন্তু সনাতন বিরোধী মুখ হিসেবেই চেনে। সবাই জানে আপনি রাজনীতির জন্য বলিপ্রদত্ত। যা খুশি করতে পারেন। এই যেমন আপনি এখন মোদীজীর দর্শন পাওয়ার জন্য মরিয়া। যান, দর্শন করুন। কথা বলুন। তবে দিদি আগে থেকেই বলে রাখছি তিনি কিন্তু কঠিন প্রকৃতির মানুষ। আপনি ভাইদের দিয়ে যে দুর্নীতি করিয়েছেন তার প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত রেহাই নেই। □

অতিথি কলম

'হিন্দু' কোনো 'মতবাদ' নয়

কে.এ. বরদীনাথ

'হিন্দু' শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা কী? হিন্দুইজম্ না হিন্দুত্ব? সনাতন ধর্মের সংজ্ঞা কী? এ সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত হলো ৩ দিন (২৪-২৬ নভেম্বর, ২০২৩) ব্যাপী 'দ্য ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস' বা 'বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন'। বিশ্বের ৬১টি দেশ হতে ২,০০০-এরও বেশি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, সংগঠন ও প্রতিনিধিদের সমাগমে এই চতুর্বার্ষিকী সম্মেলন একটি ম্যারাথন অধিবেশনে পরিণত হয়। গভীর চিন্তন ও বিমর্শ আধারিত এই অধিবেশনে— তত্ত্ব, দর্শন ও মানব জীবনের চিরন্তন পথনির্দেশ সংবলিত ব্যাখ্যা সমূহের দ্বারা হিন্দুত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রবল প্রচেষ্টা চলে। 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে 'হিন্দু' শব্দের শেষে 'ism' শব্দ যোগের রীতি পরিত্যাগের বিষয়টি এই সম্মেলনে আগত হিন্দু নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিদের দ্বারা গত ২৪ নভেম্বর এই সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে গৃহীত হয়। এই ঘোষণা অনুযায়ী, 'হিন্দুইজম্' শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে, বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে বসবাসরত ১২০ কোটিরও বেশি মানুষের জীবন দর্শন— 'হিন্দুত্ব' নামে পরিগণিত হবে।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে নতুনভাবে পরিচিত ও অবহিতদের কাছে হিন্দুইজম্, হিন্দুত্ব ও হিন্দুনেস— সমার্থক শব্দ মনে হলেও ধর্মানুশীলনকারীদের চোখে, সনাতন ধর্মে উল্লেখিত ও বর্ণিত জীবন পদ্ধতি, মানব জীবনশৈলী বা জীবন দর্শন হলো হিন্দুত্ব। সজীব ও নির্জীব— উভয় জীবন উপাদানের সমন্বয়ে সদাচরণকারী, ধার্মিক ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়ের চিরন্তন জীবনকেন্দ্র হলো— 'হিন্দুত্ব'।

'হিন্দুইজম্' শব্দ প্রত্যাখ্যানের এই বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুদের বা হিন্দুত্বকে একটি সামাজিক নিপীড়নের মাধ্যম, বৈষম্যমূলক মনোভাব বা অন্ধবিশ্বাস হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার, চিহ্নিত করার ১৫০ বছর প্রাচীন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে 'Hindu' শব্দের শেষে 'ism' শব্দ প্রয়োগের সংযোগ রয়েছে। 'Hinduism'— শব্দের উৎস অনুসন্ধান করলে খোঁজ পাওয়া যায় এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের। এই 'Hinduism' শব্দ ছিল বিশ্ব মানবতার বিকাশ কেন্দ্র এবং বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাকে অসম্মানিত ও হীন প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে রচিত বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। বাস্তবে, এই 'isms' বা মতবাদসমূহ— পশ্চাদ্‌গামী, অধোগামীসম্পন্ন, উগ্র ধর্মান্ধতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী এই সকল মতবাদসমূহ বিভাজনমূলক হওয়া ছাড়াও ক্ষতিকারক ও নেতিবাচক। মানব জীবনের মূলধারাবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের পরিচায়ক হলো এই 'isms', বা মতবাদসমূহ। এহেন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই বৃহত্তম ধর্মসভা 'দ্য ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস' বা 'বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন'— আন্তর্জাতিক স্তরে 'Hinduism' শব্দকে দৃঢ় ও সর্বৈব ভাবে খারিজ ও বাতিল ঘোষণা করেছে। এই শব্দের প্রচলনের ইতিহাসটিও বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন দ্বারা এই শব্দটিকে বাতিল ঘোষণার অন্যতম কারণ।

মোনিয়ার মোনিয়ার-উইলিয়ামস তাঁর লেখা 'Hinduism' বিষয়ক একটি বইতে প্রথম এই 'Hinduism' শব্দ বা পরিভাষাটির প্রবর্তন ও প্রচলন করেন। মনে রাখতে হবে যে, ১৮৭৭ সালে 'দ্য সোসাইটি ফর প্রোমোশন অব ক্রিশ্চিয়ান নলেজ' ছিল মোনিয়ার উইলিয়ামসের 'Handbook on Hinduism' বইটির প্রকাশক। হিন্দু সমাজের ব্যাপক ধর্মান্তরণের লক্ষ্যে ১৫০ বছর ব্যাপী খ্রিস্টানদের এই ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারের ফলাফল 'Hinduism' নামক পরিভাষাকে এই কারণে দ্য ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস

'হিন্দুত্ব' ও 'সনাতন ধর্ম'কে সামনে রেখে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত আগামীদিনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রসমূহে অর্থবহ ভূমিকা অবলম্বনে আগ্রহী ও কার্যকরী দায়িত্বে অবতীর্ণ হিন্দুসমাজের মানসপটে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ সমগ্র মানব সমাজকে একটি বিশ্বজনীন পরিবার রূপে উপলব্ধির ক্ষেত্রে এহেন পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সকল 'isms' বা মতবাদের ঊর্ধ্বে 'হিন্দুত্বের' অবস্থান ব্যাখ্যা করে, সনাতন ধর্ম অনুযায়ী— 'হিন্দুত্ব' একটি সম্পূর্ণ জীবন দর্শন বলে এই সম্মেলনে তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত।

সনাতনীদের হীন প্রতিপন্নের ষড়যন্ত্র : এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, হিন্দু-বিরোধী ন্যারেটিভ বা আখ্যান তৈরি, হিন্দুদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টা, এমনকী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আস্থার প্রতীক ধার্মিক- আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গ তথা সাধু- সন্তমণ্ডলীকেও ছাড় না দেওয়ার এই প্রবণতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই একটি বৃহত্তর ছক বা গেম-প্ল্যানের অংশ হিসেবে এই বৌদ্ধিক অসততার পেছনে ক্রিয়াশীল এর আসল উদ্দেশ্য। এই সুচিন্তিত ও ১৫০ বছর ধরে বাস্তবায়িত সুনিপুণ পরিকল্পনাকে অনাবৃত ও উন্মোচিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন ছিল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এটা ঠিক যে, এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী হিন্দুসমাজ, 'হিন্দুত্ব' বা 'Hinduness' দ্বারা পরিচিত ও আখ্যায়িত হতে সংকল্পবদ্ধ হচ্ছে— সকলের যোগদান ও অনুসরণের মাধ্যমে সনাতন ধর্মানুযায়ী যে জীবন দর্শন (হিন্দুত্ব) সকলের সংস্থান ও সহাবস্থানকে দৃঢ় ও সুনিশ্চিত করে। বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'হিন্দুত্ব'-এর ধারণা অপেক্ষাকৃত সহজতর, যা বহু সহস্রাব্দ-ব্যাপী এই দর্শনের চিরন্তন প্রকৃতি এবং হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবনধারা বা জীবন-প্রণালীর নির্দেশক ও সূচক। রাজনৈতিক উপযোগিতা, নীতি, অনুরাগ, সংস্কার ও ব্যক্তিগত প্রবণতার মতো বিষয়ের প্রেক্ষিতে 'সনাতন ধর্মের' সঙ্গে 'হিন্দুত্ব'-এর ধারণার সংযোজনের সিদ্ধান্ত বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে মান্যতালাভ করেছে। কারণ, হিন্দুত্ব ও সনাতন ধর্মকে— বিপ্রতীপ মেরুতে অবস্থানকারী দুটি তত্ত্বরূপে বর্ণনার মাধ্যমে মানবজীবনের শুভ ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর চেতনা সমূহের এপর আক্রমণ হানা চলছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁর ভাষণে ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামিকে মদত দেওয়ার উদ্দেশ্যে হিন্দুত্ব ও সনাতন ধর্ম সংক্রান্ত অপব্যাখ্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। পুঁজিবাদ (capitalism), সাম্যবাদ (communism) ও বস্তুবাদ (materialism)-এর অনেক ঊর্ধ্বে হিন্দুত্বের অবস্থানের বিষয়টি বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের উদ্বোধন পর্বে মোহনজীর অভিভাষণে উপস্থাপিত হয়।

এইসব 'isms' (মতবাদ) ও 'religions' (উপাসনা পদ্ধতি) কিছু মানুষের বস্তুজগৎকেন্দ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে বা জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মেটাতে সমর্থ হলেও প্রকৃত আনন্দ, সৌভাগ্য, শান্তি ও জগতের সার্বিক কল্যাণ আজও অধরা। হিন্দুবিরোধী অশুভ শক্তির দ্বারা হাজির করা হিন্দুত্বের ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে তাদের অপব্যাখ্যার বিপ্রতীপে হিন্দুত্বের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে মোহনজীর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় হিন্দুত্বের আত্তীকরণ, সমন্বয়শীলতা, একাত্মতা ও পরমতসহিষ্ণুতার মহান বাণী ও দর্শন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, সকল সম্প্রদায় ও পরম্পরাসমূহ হিন্দুত্বের বৃহৎ ছত্রতলে সম্মিলিত হয়ে একত্রে স্নিগ্ধতা লাভ করেছে, পবিত্রতা অর্জন করেছে। এহেন সহনশীল, সমন্বয়বিধানকারী ছাতাটি ভারতীয় রীতি, পদ্ধতি, পরম্পরার সম্মেলন ছাড়াও, দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে আগত ও বসবাসরত, অন্যান্য মত ও উপাসনা পদ্ধতির ধারক-বাহক বহিরাগতদের আশ্রয়স্থলেও পরিণত হয়েছে।

'ধর্মের' ব্যাখ্যা : এই বছর বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের থিম বা বিষয়টি ছিল— 'জয়স্য আয়তনং ধর্মঃ', অর্থাৎ ধর্ম হলো বিজয়কেন্দ্র বা বিজয়স্থল। এই বাণীর উদ্ঘোষের মাধ্যমে এই সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরসঙ্ঘচালক মোহনজী বলেন যে, কোনো অনিশ্চিত শর্তাবলীর প্রয়োগের প্রশ্ন ছাড়াই অন্য কারও এপরে বিজয়প্রাপ্তি বা বিজয় ঘোষণার বিষয়ে হিন্দুরা কোনোভাবেই আকাঙ্ক্ষী বা অভিলাষী নয়। এর পরিবর্তে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও বস্তুতান্ত্রিক স্তরে সকলের উন্নতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির বিস্তার হিন্দুরা প্রার্থনা করে।

মাতা অমৃতানন্দময়ী হিন্দুত্ব ও সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন। 'আম্মা' নামেই অধিক পরিচিত কেরালা নিবাসী মাতা অমৃতানন্দময়ী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাজমান অনন্ত চৈতন্যসত্তা ও অশেষ অখণ্ড জ্ঞানের উল্লেখ করেন, যা লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সমর্পিত জ্ঞানসাধনা অন্য সব মত হতে সনাতন ধর্মকে পৃথক করে। 'হিন্দুত্ব' ও 'সনাতন ধর্ম'কে সামনে রেখে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত আগামীদিনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রসমূহে অর্থবহ ভূমিকা অবলম্বনে আগ্রহী ও কার্যকরী দায়িত্বে অবতীর্ণ হিন্দুসমাজের মানসপটে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ সমগ্র মানব সমাজকে একটি বিশ্বজনীন পরিবার রূপে উপলব্ধির ক্ষেত্রে এহেন পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

(লেখক সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড অ্যান্ড হোলিস্টিক স্টাডিসের ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ)

শোকসংবাদ

পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের স্বয়ংসেবক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ প্রচার প্রতিনিধি মধুসূদন দেবনাথ গত ১ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তিনি সঙ্ঘের এবং বিবিধ ক্ষেত্রের বহু দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একমাত্র পুত্রকে রেখে গেছেন।

ভারতীয় প্রযুক্তিতে সজ্জিত হচ্ছে দেশের বায়ুসেনা

ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করতে তৎপর হয়েছে মোদী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এ ব্যাপারে বায়ুসেনাকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে তারা। আর এ ব্যাপারে তারা শিক্ষা নিচ্ছে সাম্প্রতিক ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ থেকে। বায়ুসেনার ৯১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গুয়াহাটির অনুষ্ঠানে এয়ার অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ (ইস্টার্ন এয়ার কমান্ড) এয়ার মার্শাল এসপি ধরকর দাবি করেন বায়ুসেনা-ঘাঁটির সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি এও জানান, 'ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে। জঙ্গিরা যে কায়দায় হামলা চালিয়েছে তা একেবারেই নতুন। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী যে ভাবে দ্রুত প্রত্যাঘাত হেনেছে, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।'

এর পরই চীন, পাকিস্তান ও মায়ানমার সীমান্তের ড্রোনের মাধ্যমে মাদক ও হাতিয়ার চোরাচালানের বিষয়টি তুলে ধরেন বায়ুসেনার এই শীর্ষকর্তা। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান ও মায়ানমারের সন্ত্রাসবাদীরা প্রায়ই ড্রোনের মাধ্যমে ভারতে চোরাচালানের চেষ্টা করে। আমাদের জন্যেই তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে জঙ্গিরা চীনের তৈরি ড্রোন ব্যবহার করছে। সেই প্রমাণ আমরা পেয়েছি।'

গত ৭ অক্টোবর গাজা স্ট্রিপ থেকে দক্ষিণ ইজরায়েলের একাধিক শহরে প্যারাগ্লাইডিং করে ঢুকে পড়েছিল হামাস জঙ্গিরা। এই বিষয়টিও তুলে ধরেন বায়ুসেনার শীর্ষ অফিসার। তাঁর কাথায়, 'এটা একেবারে একটা নতুন পদ্ধতি। যেটা এই যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে আমরা জানতে পারি। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। সেটা ঠেকানোর জন্য যাবতীয় প্রস্তুতিও নিচ্ছি। আকাশপথে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।'

তবে ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের কিছু মূলগত পার্থক্যের বিষয়টিও তুলে ধরছেন বায়ুসেনা-বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের যুক্তি, ভারতের তুলনায় ইজরায়েলের আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা অনেকটাই ছোটো। শুধু তাই নয়, সেখানে বৈচিত্র্যও কম। অর্থাৎ সীমান্তে বরফে ঢাকা সুউচ্চ পাহাড় থেকে শুরু করে জঙ্গল, মরুভূমি ও জলাভূমি এলাকা নেই। যা সুরক্ষিত রাখা অনেক বেশি কঠিন বলে মানছেন এয়ার মার্শাল ধরকরও।

তাই এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস ফাইটার জেটকে আরও শক্তিশালী করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধবিমানে বসানো হচ্ছে উন্নত রাডার ও ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম। যুদ্ধবিমানের মধ্যে থাকা পুরনো কিছু যন্ত্র বাতিলও করা হয়েছে। এর জেরে ভবিষ্যতে বায়ুসেনার অন্যতম হাতিয়ার তেজস আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করেছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। বেশ কয়েক বছর ধরেই লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট (এলসিএ) মার্ক ওয়ান-এ 'তেজস' ব্যবহার করছে এয়ারফোর্স। সূত্রের খবর, এবার তাতে 'উত্তম' রাডার ও 'অঙ্গদ' ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার স্যুট বসতে চলেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতেই উত্তম ও অঙ্গদকে তৈরি করা হয়েছে। ধীরে ধীরে এই দুই সিস্টেম বায়ুসেনার হাতে থাকা সমস্ত তেজস যুদ্ধবিমানেই বসানো হবে।

উল্লেখ্য, তেজস যুদ্ধবিমানের নকশা তৈরি করেছে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও। হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্যাল লিমিটেড তৈরি করেছে এই ফাইটার জেট। ভারতের বাইরেও বিভিন্ন এয়ার শো-তে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তেজস। বায়ুসেনার তরফে বর্তমানে ৮৩টি তেজসের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। যা একশো ছুঁতে পারে বলে প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে খবর। মন্ত্রকের এক আমলা জানিয়েছেন, 'বায়ুসেনাকে প্রথম লটের যে তেজস বিমানগুলি দেওয়া হবে, তাতে দেশীয় প্রযুক্তির রাডার ও ইলেকট্রনিক্স ওয়ারফেয়ার স্যুট থাকবে। ৪১তম জেট থেকে ভারতের তৈরি রাডার ও ইংলেকট্রনিক্স স্যুট সেখানে বসানো হবে। আমরা এভাবেই বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি একটু একটু করে কমাচ্ছি।'

প্রসঙ্গত, উত্তম ও অঙ্গদ--- দু'টি সিস্টেমকেই বহু পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। শেষে এগুলিকে যুদ্ধবিমানে বসানোর অনুমতি দেয় ভারতীয় বায়ুসেনা। আধুনিক বদলে যাওয়া যুদ্ধ কৌশলের কথা মাথায় রেখে এই দুটি সিস্টেমকে তৈরি রেছে ডিআরডিও।

বায়ুসেনা সূত্রে আরও খবর, রাশিয়ার তৈরি মিগ যুদ্ধবিমাগুলিকে এবার আস্তে আস্তে অকার্যকরী করা হবে। সেই জায়গা নেবে তেজস। এছাড়াও অ্যামকা নামের একটি ফাইটার জেট তৈরি করছে ডিআরডিও। তেজসের থেকেও শক্তিশালী সেই যুদ্ধবিমানের প্রথম উড়ান কবে হবে, তা অবশ্য এখনও ঘোষণা করা হয়নি। সম্প্রতি হ্যালের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল ভি আর চৌধুরী। সূত্রের খবর, সেখানে দ্রুত যুদ্ধবিমান নির্মাণের কাজ শেষ করা হবে কথা হয়েছে। এছাড়াও প্রচণ্ড-র মতো হামলা চালাতে সক্ষম কপ্টারও বায়ুসেনা চাইতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, দেশীয় প্রযুক্তিতে সেজে উঠতে চলেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। □

ধর্ম্য সংগ্রাম—গীতার সরলতম উপদেশ

গীতার যে কোনো উপদেশকে গ্রহণ করার সময় সেই উপদেশ পালনের যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

ড. রাকেশ দাশ

ভারতীয় জীবনচর্যায় মনুষ্য জীবন চতুর্বিধ পুরুষার্থে সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চতুর্বিধ পুরুষার্থের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হতে পারে। মোক্ষই পরম বা চরম পুরুষার্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। সমস্ত বেদ ও উপনিষদ্-সহ সমস্ত প্রমুখ শাস্ত্রই একবাক্যে উপদেশ করে থাকে যে, পরম সত্যকে জানাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু মোক্ষই একমাত্র পুরুষার্থ নয়। ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কামও মনুষ্যজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ত্রিবর্গকে অস্বীকার করে কেবল মুক্তির অন্বেষণ সমাজ জীবনে চরম অনাচার ও অধঃপতন ডেকে আনতে পারে।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চার পুরুষার্থের যথার্থ বোধ ও পুরুষার্থ পালনের উপায় নির্দেশের জন্য ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্রের রচনা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা মোক্ষশাস্ত্র রূপে পরিগণিত। এই শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য মোক্ষপথযাত্রী মনুষ্যের মার্গদর্শন। কিন্তু গীতাশাস্ত্র জীবন ও জগৎকে উপেক্ষা করে বৈরাগ্য মাত্র সহায়ে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে মোক্ষের পথ প্রদর্শন করে না। বরং, ত্রিবর্গ সাধনকে কীভাবে মোক্ষানুকূল করা যায় তার দিশানির্দেশ দেয় গীতা। এই সাত শত শ্লোক ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন পরমেশ্বরের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমোঘ বাণী। এর প্রতিটি বাক্য মন্ত্রতুল্য। এই গ্রন্থকে খণ্ড খণ্ড করে বুঝতে গেলে অনর্থ হয়। সাতশত শ্লোক একত্রিত ভাবে গীতার বাস্তবিক তাৎপর্য প্রকাশ করে। প্রকরণ বহির্ভূত ভাবে কোনো শ্লোক উদ্ধৃত করে কোনো প্রকার অর্থ নির্ধারণ করা অনুচিত।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার আঠারোটি অধ্যায়ে সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের মতো সাধকবৃন্দ গীতার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুকে চতুর্যোগে (জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ) বিভাজিত করেছেন। এই বিভাজন যথার্থও বটে। গীতার অবতরণ ঘটেছিল বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। বহুশাস্ত্রবিদ এবং অসামান্য তপস্বী অর্জুন বিষণ্ণ অবস্থাতেও যে সকল প্রশ্ন উপস্থাপন করেছিলেন সেগুলি ভ্রান্ত বা অনর্থক ছিল না। কিন্তু ভগবান উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই সমস্ত প্রশ্নের আড়ালে অর্জুন নিজের বিষণ্ণতাকে ঢাকার প্রচেষ্টা করছেন। সেজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জুনকে ক্লীব ও দুর্বল (২। ৩) বলে প্রচণ্ড কশাঘাত করেছেন। এবং এই কশাঘাতে অর্জুনের বিষণ্ণতার আড়ালটি খসে পড়েছে। অর্জুন নিজের বিষণ্ণতা ও অসহায়তার কথা স্বীকার করে সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে বলেছেন, 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,— যা আমার জন্য নিশ্চিত ভাবে শ্রেয়স্কর সেইটিই উপদেশ কর (২। ৭)। এর পরে ভগবান ধীরে ধীরে অর্জুনের মনের সমস্ত বিভ্রান্তি ও সংশয় দূর করেছেন। যে ভগবান প্রথমে অর্জুনকে ক্লীব ও দুর্বল সম্বোধন করে প্রবল তিরস্কার করেছেন তিনিই আবার উপদেশান্তে অর্জুনকে বলেছেন, 'যথেচ্ছসি তথা কুরু'— যেটা ভালো বোঝো সেটা কর (১৮। ৬৩)। যে অর্জুন যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র ত্যাগ করে বসে পড়েছিল সেই অর্জুনও উত্তরে বলেছেন, 'স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব'— আমার সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়েছে। এর পরে তোমার দেখানো পথেই আমি চলব (১৮। ৭৩)।

সম্পূর্ণ গীতাতে নানাবিধ আপাতবিরুদ্ধ উপদেশ রয়েছে। কোথাও ভগবান বলেছেন, 'ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্'— তুমি ওঠো, যশ লাভ কর, শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর' (১১। ৩৩)। আবার কোথাও তিনিই অহিংসা ও অক্রোধকে দৈবী সম্পদ্ (১৬। ২) বলে উল্লেখ করে উপদেশ করেছেন যে, দৈবী সম্পদের দ্বারাই মুক্তিলাভ সম্ভব (১৬। ৫)।

কোথাও তিনি বলেছেন, 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে'— জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে' (৪। ৩৭)। কোথাও তিনিই আবার বলেছেন, 'কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর'— হে কৌন্তেয় আসক্তিহীন ভাবে কর্ম করে যাও (৩। ৯)। অর্থাৎ কখনও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন, কখনও কর্মের অবশ্যকর্তব্যতা। প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলিতে জ্ঞান ও কর্মমুখী উপদেশের মধ্যে কোথাও ভক্তির বিশেষ চর্চা না হলেও দশম অধ্যায়ের পর থেকে ধীরে ধীরে ভক্তির প্রাধান্য দেখা গিয়েছে। ইন্দ্রিয়সংযমরূপ রাজযোগের উপদেশ সম্পূর্ণ গীতা জুড়েই পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত উপদেশের শেষে অর্জুন বৈরাগ্য আশ্রয় করে সংসার ত্যাগ

ফঃ ২

করে মোক্ষপথের অনুগামী হননি। বরং বিজিগীষু মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

উপরে উপরে এবং বিচ্ছিন্নভাবে এই সমস্ত উপদেশের অর্থ অনুধাবন করতে গেলে গীতার অনর্থই বেশি হয়। সেজন্য প্রয়োজন গীতার নিত্য ও সার্বিক অনুধ্যান। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান অর্জুনের উত্থাপিত বিবিধ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেশগুলিকে সুবিন্যস্ত করেছেন। যে কোনো উপদেশের প্রেক্ষাপটে থাকা প্রশ্নগুলি এবং সেই প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে থাকা পূর্বতন উপদেশগুলির আলোকেই গীতার উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ভগবানের উপদেশের প্রেক্ষাপট। ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধে প্রেরিত করার জন্যই গীতার উপদেশ দিয়েছেন।

ধর্মের ক্রোড়ে সমাজের স্থিতি। ধর্ম রক্ষিত হলে তবেই সমাজ সুরক্ষিত থাকে। সমাজ বা সমষ্টি সুরক্ষিত না থাকলে ব্যক্তির সুরক্ষা অসম্ভব। ধর্মকে সুরক্ষিত রাখার উপায় ধর্মের আচরণ বা পালন। ধর্ম পালনের দুটি উপায়— প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। যাঁর চিত্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের কলুষ থেকে মুক্ত নয় তিনি প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম পালনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে মুক্তির পথে অগ্রসর হবেন। যাঁর চিত্ত শুদ্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র নয় তিনি নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম পালনের মাধ্যমে ব্রাহ্মী স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হবেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে ভগবান দু' প্রকার ধর্মেরই স্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

অর্জুন প্রথম অধ্যায়ের শেষে অস্ত্র ত্যাগ করে নিবৃত্তির পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। তখন ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং অর্জুনকে বুঝিয়েছেন যে, অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে ওঠেননি। সুতরাং অর্জুনের পালনীয় ধর্ম প্রবৃত্তিমুখ। সেই প্রবৃত্তিমুখীনতাকে কীভাবে আত্যন্তিক কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়া যায় সেই কথা বর্ণনা করে ভগবান ধর্মের প্রতি চিত্তের একাগ্রতার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন। অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগে যে, বায়ুর সমান চঞ্চল চিত্তকে একাগ্র করার উপায় কী? ভগবান তার উত্তরে দুটি সূত্র দেন— অভ্যাস ও বৈরাগ্য। অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে অবলম্বন করে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করে সমস্ত কর্মকে নিষ্কাম ও ঈশ্বরমুখী করে তোলার মাধ্যমে দৃঢ় ভক্তি সম্পাদন গীতায় রয়েছে। সেই ভক্তিকে অবলম্বন করে ক্ষুদ্র অহংকারকে স্তিমিত করে সমষ্টির সঙ্গে নিজের একাত্মতা উপলব্ধির উপায় সম্পর্কে ক্রমবদ্ধ উপদেশ নিবদ্ধ করা হয়েছে গীতাতে। শেষ ভাগে এসে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের অবস্থান পরীক্ষার প্রায়োগিক উপদেশের মধ্যে দিয়ে উপসংহার করা হয়েছে।

গীতার প্রতিটি উপদেশ সকলের জন্য নয়। সাধনার বিভিন্ন স্তরে স্থিত এবং বিবিধ মানসিক অবস্থায় বিদ্যমান ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা অনুসারে একেকটি উপদেশ একেক জনের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং গীতার যে কোনো উপদেশকে গ্রহণ করার সময় সেই উপদেশ পালনের যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বলা হয় পার্থকে বৎস করে সুধী ব্যক্তিবর্গের জন্য গীতারূপ দুগ্ধ দোহন করেছেন গোপাল। নানা অবস্থানে অবস্থিত সুধী ব্যক্তিদের সকলেরই উপযুক্ত উপদেশ গীতায় রয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে ধর্মের গ্লানি প্রবল। ধর্ম আচরণকারীর সংখ্যা নগণ্য। এবং সেই ধর্মাচরণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঁচিয়ে থাকা নানা ধরনের রাক্ষসী শক্তির বাড়বাড়ন্ত ভয়াবহ। সেই অপশক্তি কোথাও অন্যের ভূমি কেড়ে নিচ্ছে, কোথাও মাতৃশক্তিকে অবদমিত ও অপমানিত করছে। অসংখ্য মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। সর্বোপরি, সমগ্র মানবজাতিকে প্রবল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার দিকে ঠেলে দিয়ে মানবিকতার মূলোচ্ছেদে উদ্যত হয়েছে দানবীয় প্রবৃত্তি। এমতাবস্থায় গীতাতে এমন কোনো উপদেশ রয়েছে যেটি আমাদের সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে?

এই অধর্মচারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। বর্তমানে লোককল্যাণকামী হিন্দু সমাজের জন্য গীতার প্রধানতম উপদেশ— 'অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যাসি।।(২। ৩৩) —যদি তুমি এই যুদ্ধ না কর তবে ধর্ম ও কীর্তি হারিয়ে পাপের ভাগী হবে।'

ধর্ম রক্ষার সংগ্রামে মোহ, বিষণ্ণতা জলাঞ্জলি দিয়ে বিজিগীষু মনোবৃত্তি নিয়ে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিতেই হবে আমাদের সকলকে। নিজের সামর্থ্য ও স্বভাব অনুসারে অস্ত্র চয়ন করে বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুর উপর। দুষ্টের বক্ষের রক্তে ধুয়ে দিতে হবে লাঞ্ছিতা মায়ের উন্মুক্ত কেশপাশ। ধর্ম রক্ষার জন্য এই নিঃস্বার্থ সংগ্রামই আমাদের প্রতিষ্ঠিত করবে ব্রাহ্মী স্থিতিতে। ঈশ্বর লাভের এত সহজ উপায় বোধহয় আর কিছু হতে পারে না।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সনাতন ধর্মের প্রতি কিছু রাজনীতির কারবারীদের এত আক্রোশ কেন?

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা চিরকালই সহিষ্ণু। তাদের বিচারবোধ, আধ্যাত্মিকতা অন্য সকলের থেকে ভিন্ন। দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে সনাতন ধর্মের অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বলতে গেলে হিন্দুদের দেব-দেবী, সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রঙ্গ-তামাশা অবাধে চলছে, অথচ হিন্দু সমাজ নীরবে সহ্য করে আসছে, কোনও প্রতিবাদ বা জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি কোনোদিন। সেই কারণেই হিন্দু দেব-দেবীদের ব্যঙ্গ করে সিনেমা, নাটক, নৃত্য, সংগীত, কবিতা, কার্টুন অবাধে তৈরি হয়ে চলেছে।

বামপন্থী ভণ্ড বুদ্ধিজীবীর দল প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতা শহরের একটি জনবহুল রাস্তায় গোমাংস ভক্ষণ করে ধর্মনিরপেক্ষতা দেখায়। এই উল্লাসে অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশই সনাতন ধর্মাবলম্বী। এটি মাত্র কিছুদিন আগের কথা। প্রশ্ন জাগে, এই সেকুলারপন্থীরা প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওরকম হইচই করে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে নিয়ে শুয়োরের মাংস খাওয়ার সাহস কোনোদিন দেখাতে পারবেন? উত্তরটা সবার জানা, কোনোদিন পারবে না। কারণ তাহলে 'সর তন্‌সে জুদা' হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল।

হাজার বছর ধরে হিন্দু সমাজ অর্থাৎ ভারতীয়রা বহিরাগত অত্যাচারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কোটি কোটি হিন্দু নিহত হয়েছে, নারীর সম্মান লুণ্ঠিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, মন্দিরের সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়েছে, কিন্তু সনাতন ধর্মের বিনাশ সাধন তারা করতে পারেনি, আজও ভারতে আশি শতাংশ মানুষ হিন্দু সমাজের।

সম্প্রতি ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন আসন্ন জেনে কতগুলি রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে I.N.D.I.A. নামে একটি জগাখিচুড়ি গোষ্ঠী বানিয়েছে। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত। কেউ কেউ জামিনে খালাস আছেন যেমন রাহুল গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধী, তাঁরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পার্টির বংশানুক্রমিক নেতা-নেত্রী। আছেন আরজেডি দলের প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব যিনি পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন। বিচারাধীন বন্দি হিসাবে নয়, convicted হয়ে লালুপ্রসাদ জেলে ছিলেন। এই গোষ্ঠীতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সদলবলে যোগ দিয়েছেন। এছাড়া আছে দক্ষিণের ডিএমকে, কাশ্মীরের পাকিস্তানপ্রেমী মেহবুবা মুফতি, ফারুক আবদুল্লা, বাল ঠাকরের কুপুত্র উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি-র শারদ পাওয়ার, সমাজবাদী পার্টি প্রভৃতি।

এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের নিজেদের মধ্যে কোনও সদ্ভাব নেই। অধিকাংশই আঞ্চলিক দল এবং এদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ, ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। সব থেকে হাস্যকর বিষয় হলো যে এদের কারও সঙ্গে কারও আদর্শগত কোনও মিল নেই, কোনও কমন অ্যাজেন্ডা নেই। এদের একটাই উদ্দেশ্য যেনতেন প্রকারেণ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করা। 'মোদী হঠাও' এটাই একমাত্র কমন অ্যাজেন্ডা যা এই দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাগুলিকে একত্র এনেছে। মোদীকে হঠাতে পারলে আবার ব্যাপক হারে এরা নানাবিধ দুর্নীতি অবাধে চালাতে পারবে, তাতে দেশের স্বার্থ চুলোয় যাক।

কংগ্রেস দল জওহরলাল নেহরুর আমল থেকেই হিন্দুবিদ্বেষী। এই তথ্য একটি ঐতিহাসিক সত্য যা কিনা রেকর্ডেড। এ বিষয়ে বিশদে বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।

> **'অনেক গ্রন্থপাঠে যাহা না শিখিতে পারো, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের মতো দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে অধিকতর শিক্ষা দিতে, তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে।'**

আই.এন.ডি.আই.এ নামাঙ্কিত গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক বক্তৃতাগুলি শুনলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এরা সকলেই হিন্দুবিদ্বেষী। ডিএমকে-র মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের পুত্র উদয়নিধি এক জনসভায় সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন যে সনাতন ধর্মের অবিলম্বে বিনাশসাধন করতে হবে, দেশকে সনাতনমুক্ত করতে হবে, কারণ এটি একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর, ভয়ানক ধর্ম। ওই একই দলের আরেক নেতা এ রাজা বলেছেন, সনাতন ধর্ম এইচআইভি, কুষ্ঠ রোগের মতোই ভয়ানক, সুতরাং এই ধর্মের অবলুপ্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়, যদি দেশকে বাঁচাতে হয়।

সনাতন ধর্মের সমালোচনা করা, তার বিরুদ্ধে বলাটাই যেন এই ডটেড গোষ্ঠীর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী সুপ্রিম কোর্টে রীতিমতো এফিডেবিড দিয়ে জানিয়েছিলেন যে রামচন্দ্র একটি কাল্পনিক চরিত্র, এই চরিত্রের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা কপিল সিব্বাল সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন যে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে যেন সুপ্রিম কোর্ট রামজন্মভূমি সংক্রান্ত মামলার রায় না দেয়। কারণ তিনি জানতেন যে মামলার রায় তাঁদের দলীয় অবস্থানের বিরুদ্ধে যাবে, ফলে জনমত তাঁদের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

২০১৮ সালে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস দলের নেতা কমলনাথ বলেছিলেন, 'যদি ৯০ শতাংশ মুসলমান ভোট আমরা না পাই, তাহলে আমরা শেষ হয়ে যাব। এই দলটির ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ দেশবাসী তো ১৯৪৭ সাল থেকেই দেখে আসছে। দেশকে তিন টুকরো এরাই করেছিল ধর্মের ভিত্তিতে। দেশকে এরা কি আরও ছোটো আকৃতির করতে চায়? 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর বিরুদ্ধে এরা আজ পর্যন্ত নিন্দাসূচক কোনও বিবৃতি দেয়নি, উলটে এদের সমর্থন জানিয়েছে।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী যিনি কোনও প্রকার হোমওয়ার্ক না করেই দেশে-বিদেশে নিয়মিত বক্তৃতা দিয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে বেড়ান। তাঁর সনাতন ধর্মের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকারই কথা। তাঁর মা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী, তাঁর পিতামহ ও মাতামহ কেউই সনাতন ধর্মের অনুরাগী ছিলেন না। রাহুল গান্ধীর পিতা তামিলদের দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন— ভারতীয় তামিল ও শ্রীলঙ্কান তামিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, ভারতের সকল সম্পদে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কংগ্রেস দল থেকে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়নি।

যখন উদয়নিধি সনাতন ধর্মের বিনাশের কথা, সনাতন ধর্মের বিলুপ্তির প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ্য সভায় বলেন, তখন দক্ষিণের বিশিষ্ট অভিনেতা কমল হাসান নির্দ্বিধায় বলেন যে, 'উদয়নিধি বাচ্চাছেলে, রাজনীতিতে নতুন এসেছেন।' তা মানে তিনি বলতে চাইছেন যে ছেচল্লিশ বছর বয়সের উদয়নিধি ছেলেমানুষ, তাই তাঁর কথা নিয়ে হইচই করা উচিত নয়! আশ্চর্যের ব্যাপার হলো নূপুর শর্মা হাদিসের একটি তথ্য যখন মিডিয়ায় সনাতন ধর্মের নিন্দার প্রতিবাদে পেশ করেছিলেন, যেটা তাঁর নিজের বক্তব্য ছিল না, তার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল দেশবাসী মনে রেখেছে। নূপুর শর্মাকে তাঁর দল বহিষ্কার করেছিল। তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হতে থাকে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তরফ থেকে এমনকী তাঁর উপর বলাৎকারের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হতে থাকে। তিনি আজও ঘরবন্দি আছেন। তাঁর বয়স কিন্তু আটত্রিশ বছর মাত্র। তাঁর বেলা কমল হাসানের দল টুঁ শব্দটি করেনি। প্রতিবাদ করা উচিত ছিল না? আসলে ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজন জানে যে হিন্দুরা শুধু নিরীহ, নিরস্ত্রই নয়, তারা ভীতুও। জেহাদিদের সমর্থনে আছে দেশের বামপন্থীরা, তৃণমূলিরা আর কংগ্রেসিরা।

২০২২-এ নির্বাচনের আগে তওসিফ রেজা ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি হিন্দুদের বলতে চান, যখন তাঁর সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা জেগে উঠবে, তখন হিন্দুরা সারা দেশের কোথাও লুকোবার জায়গা পাবে না। এই বক্তব্যের পরেও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের কি উচিত ছিল না দেশে ধর্মীয় অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য, উসকানিমূলক ভাষণ দেবার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা?

তৃণমূল দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র মা-কালী সম্বন্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করে প্রচারের আলোয় আসতে চেয়েছিলেন। তিনি সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন যে হিন্দুদের মা-কালী একজন মদ্যপায়ী, মাংসাহারী দেবী। আজ তার দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সাংসদপদ প্রশ্নের মুখে। কোনও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নিজের ধর্মের সম্বন্ধে কোনও কুরুচিকর মন্তব্য করে না, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেই বহু মানুষ আছেন যারা নিজেকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রমাণ করতে বা সস্তা প্রচার পাওয়ার লোভে স্বধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

সম্প্রতি সমাজবাদী দলের নেতা স্বামী প্রসাদ মৌর্য মা লক্ষ্মী সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে 'কখনও কারও চারটি হাত থাকতে পারে? কেউ কি কোনোদিন দেখেছেন কাউকে যার চারটে হাত? চার হাত নিয়ে কেউ জন্মেছে বলে কেউ শুনেছেন?' এর পর হয়তো তিনি বা তাঁরই সাঙ্গপাঙ্গোরা মা দুর্গার দশ হাত নিয়েও প্রশ্ন তুলবে। এই ধরনের কথাবার্তাকে 'হেট স্পিচ' বলা হবে না কেন? কেন সব সময় সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে নেতিবাচক, কুরুচিকর, মিথ্যা রটানো হয়, বিযোদ্গার করা হয়? এর কারণ সনাতনীরা প্রতিবাদ করবে না, তারা সহনশীল, হিন্দু বিদ্বেষীরা সেটা ভালো করেই জানে।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে একটি গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ডটেড গোষ্ঠী (I.N.D.I.A.) বুঝতে পেরেছে যে তাদের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে হারানো অসম্ভব, তাই তারা ছলে-বলে-কৌশলে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তার জন্য রাষ্ট্রবিরোধীদের মদত দিতেও এরা পিছপা নয়। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষজনকে তুষ্ট করার জন্য এরা মরিয়া। হিন্দু বিরোধিতা এই ইন্‌ডি গোষ্ঠীর একটি অন্যতম প্রধান অ্যাজেন্ডা। এরা চিরকালই তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন মুসলমানরা দুধেল গাই, এদের লাথি তো খেতেই হবে। বোঝাই যায় যে মুসলমানদের এরা শুধু ভোটব্যাংক বলেই মনে করে, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিয়ে এরা কোনোদিন মাথা ঘামায়নি।

ডটেড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'আপ' যারা দিল্লির বর্তমান শাসক, তাদের নেতা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেছেন, দিল্লির ভয়ানক পরিবেশ দূষণের জন্য হিন্দুদের দীপাবলী উৎসব দায়ী। অথচ পঞ্জাবে শস্যক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত জঞ্জাল, যেগুলিকে ওরা 'পারালী' বলে, সেগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং সেই পারালীপোড়া ধোঁয়া বাতাস বাহিত হয়ে দিল্লিতে আসে, প্রচণ্ড বায়ুদূষণ ঘটায়, সে সম্বন্ধে কেজরিওয়াল টুঁ শব্দ করে না। কারণটা রাজনৈতিক।

ভারতের দুর্ভাগ্য যে দেশের অভ্যন্তরেই দেশবিরোধী শক্তিগুলি অতি সক্রিয়। প্রধানমন্ত্রী এদের অনেকেরই বাড়াভাতে ছাই দিয়েছেন। তাই এদের প্রচণ্ড মোদী-বিরোধিতা রাষ্ট্রবিরোধিতায় পরিণত হয়েছে। কিছু বিদেশি শক্তির মদতও আছে এদের পেছনে। এখন মোদীজীকে হারাতে তারা জোট বানিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই হিন্দুবিরোধী। গান্ধী পরিবারের হিন্দু বিরোধিতার কথা আগে বলেছি। এই দলের প্রবীণ নেতা দিগ্বিজয় সিংহ, শশী থারুর, চিদাম্বরম এরা একটি নতুন শব্দ

আবিষ্কার করেছে 'হিন্দু টেরর'। মজার ব্যাপার হলো 'মুসলিম টেরর' শব্দটি এরা কোনওদিন ভুলেও উচ্চারণ করে না, করবে না। এরা ওসামা বিন লাদেনকে বলে 'ওসামাজী'। কংগ্রেস নেতা প্রমোদ আচারিয়া স্বয়ং বলেছেন, যে 'কিছু কংগ্রেস নেতা শুধু হিন্দুত্বকে ঘৃণা করে না, রামজীকেও ঘৃণা করে।' অদ্ভুত এদের দলগত অবস্থান! কেউ কেউ শ্রীরামচন্দ্রের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, আবার কেউ কেউ তাঁকে ঘৃণা করে। যাঁর অস্তিত্বই নেই, তাঁকে কীভাবে ঘৃণা করা যায়? এর উত্তর কংগ্রেসিদের কাছে নেই।

রাহুল গান্ধী একবার খোলাখুলি বলেছিলেন, কংগ্রেস মুসলমানদের দল। এই নেতা সম্প্রতি একটি জনসভায় বলেছেন— 'ভারতমাতা কেয়া হ্যায়? ভারতমাতা কৌন হ্যায়?' এই নেতার চীনপ্রেম সর্বজনবিদিত। সে দেশের প্রশংসায় তিনি সর্বদাই পঞ্চমুখ। শি জিন পিং-কে খুশি করার জন্য এই জাতীয় কথাবার্তা বলেন কিনা, জানা নেই।

সম্প্রতি কংগ্রেস মোল্লা-মৌলবিদের সঙ্গে একটি গোপন মিটিং করেছে। তারা হিন্দু-বিরোধী কর্মসূচি নিয়ে এগোতে চায়। একদিকে রাহুল গান্ধী বলছেন— 'মেরা দল মোহব্বত কী দুকান', আবার হিন্দু-মুসলমান দু'ভাগ করে মুসলমান ভোটে জিততে চাইছেন। তুষ্টিকরণের চূড়ান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি কি তাঁর প্রমাতামহ নেহরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশটাকে আবার ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে চাইছেন? এবার ভোটে জেতার জন্য হিন্দু-বিরোধী কৌশল নিয়েছেন, দেশকে জাতপাতের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো করতে চাইছেন। তাই বলছেন অবিলম্বে জাতিভিত্তিক জনগণনা করতে হবে। কী ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা! নিম্নবর্গের লোকজন, যাতে উচ্চবর্গের লোকজনদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, সনাতন ধর্মকে যদি এই শ্রেণীবিভাগের জন্য দায়ী করা যায়, তাহলে মুসলমান ভোট প্লাস দলিত, নিম্নবর্গীয়দের ভোট 'ডটেড' জোটকে জিতিয়ে দেবে, এই আশা।

কংগ্রেস ও মোল্লা-মৌলবিদের গোপন মিটিঙের খবর একটি ভিডিয়ো মারফত জনসমক্ষে এসেছে। সেই মিটিঙে কথাও বলা হয়েছে যে গত ছয় থেকে আট মাস ধরে এই ধরনের গোপন মিটিং চলছে, তারা জামাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক। এই গোপন মিটিংগুলি তারা মসজিদে করে থাকে। সুপ্রিম কোর্ট এবং Representation of the peoles Act পরিষ্কার বলেছে যে নির্বাচনে রিলিজিয়নের কোনও ভূমিকা নেই। কংগ্রেস নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে কিন্তু বাস্তবে এই দল সাম্প্রদায়িক তুষ্টিকরণকেই আদর্শ বলে মনে করে।

'ডটেড' জোটের সদস্যদলগুলির হিন্দু বিদ্বেষ এখন তুঙ্গে উঠেছে। কংগ্রেস ও অন্যান্য সদস্যরা হামাসকে খোলাখুলি সমর্থন জানিয়েছে, যেখানে ভারত সরকার ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে যে ইজরায়েল চিরকাল ভারতের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস, তৃণমূল, বামপন্থীরা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের অত্যাচারিত হিন্দুদের প্রতি কণামাত্র সহানুভূতি দেখায়নি। ১৯৪৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত হিন্দুরা সেখান থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে কেবল ধর্মরক্ষার্থে পশ্চিমবঙ্গে দলে দলে চলে আসছে, এই ব্যাপারে হিন্দুবিদ্বেষী মোদী বিরোধী দলগুলি মৌনীবাবা সেজে থাকে। এদের ভণ্ডামি চোখে পড়ার মতো।

হাজার বছর ধরে হিন্দুরা অনেক নির্যাতিত হয়েছে, তবু হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আজ সময় এসেছে হিন্দু জাগরণের, হিন্দু ঐক্যের। হিন্দু বিদ্বেষীদের মধ্যে অনেক হিন্দুও আছেন, রাহুল গান্ধী ভোটের আগে মন্দিরে মন্দিরে ঘোরেন, নিজেকে 'দত্তাত্রেয়' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেন, অথচ তাঁর হিন্দু বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। এরা নিজেদের প্রগতিশীল, আধুনিক, লিবারেল হিসেবে তুলে ধরে অথচ এদের মনের মধ্যে কিন্তু অন্ধ হিন্দু বিদ্বেষ জাঁকিয়ে বসে আছে।

রাহুল গান্ধী সম্প্রতি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী হচ্ছেন 'পানৌতি' অর্থাৎ 'অপয়া', তাঁরই জন্য ক্রিকেটে ভারত হেরে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে 'পাপিষ্ঠ' বলতে দ্বিধা করেননি, তাঁর উপস্থিতির জন্যই নাকি ভারত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পরাজিত হয়েছে। তাঁর জন্যই নাকি বিরাট কোহলি সেঞ্চুরি করতে পারেননি। তৃণমূলের এক নেতা শান্তনু সেন তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী ভারতে তৈরি প্রথম যুদ্ধবিমান 'তেজসে' চড়ে ঘুরেছেন, এর ফলে 'তেজস' বিমানগুলি ভেঙে না পড়ে। তাঁর নাকি ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। ভাবা যায়, কী ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা! আমাদের বায়ুসেনাদেরও কি তিনি বিনাশ কামনা করছেন? এটা কি সুস্থ চিন্তা না একটি ভয়ংকর মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ?

বহু বছর বাদে ভারত একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে যিনি সকল মানুষকে সমানদৃষ্টিতে দেখেন, যিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যিনি চান 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস।' তাঁর প্রত্যেকটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সকল নাগরিকের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে।

আজ হিন্দুরা নানাদিক থেকে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় হিন্দুদের আত্মরক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার, নিজ ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন ও গর্বিত হওয়া প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের কথা আজ স্মরণ করে সমস্ত বিভেদ ভুলে নিজধর্মকে বাঁচাতে হবে। স্বামীজী বলেছিলেন—

'এই সেই ভারত, যাহা শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই সেই ভূমি যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত অপেক্ষা দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। ...আমরা এই দেশেরই সন্তান।'

তিনি আরও বলেছেন— 'অনেক গ্রন্থপাঠে যাহা না শিখিতে পারো, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের মতো দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে অধিকতর শিক্ষা দিতে, তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, ওই মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরুত্থানের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে, বার বার নষ্ট হইতেছে, আবার সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিয়া পূর্বেরই মতো অচল অটল ভাবে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং এইখানেই এই ধর্মে আমাদের রাষ্ট্রীয় মন, রাষ্ট্রীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্বিত হইবে। ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই রাষ্ট্রীয় জীবন-প্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে বিনাশ।'

ভারতের রাজনৈতিক বিরোধীরা স্বামীজীর বাণী স্মরণ করে সাবধান হবেন কী? ☐

পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল জানান দিল আসন্ন লোকসভা ভোটের ফল কী হতে চলেছে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল রবিবার প্রকাশ হয়েছে এবং মিজোরাম রাজ্যের ভোটের ফল সোমবার প্রকাশ হয়েছে। তাতে জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশে মোট আসন ২৩০। ম্যাজিক ফিগার ১১৬। বিজেপি আসন পেয়েছে ১৬৩, কংগ্রেস ৬৬, অন্যান্য ১টি। রাজস্থানে মোট আসন ১৯৯। ম্যাজিক ফিগার ১০০। আসন পেয়েছে বিজেপি ১১৫, কংগ্রেস ৭০, বিএসপি ৪, অন্যান্য ১০টি। ছত্তিশগড়ে মোট আসন ৯০। ম্যাজিক ফিগার ৪৬। আসন পেয়েছে, বিজেপি ৫৪, কংগ্রেস ৩৫, অন্যান্য ১টি। তেলেঙ্গানায় মোট আসন ১১৯। ম্যাজিক ফিগার ৬০। আসন পেয়েছে কংগ্রেস ৬৫, বিআরএস ৩৯, বিজেপি ৮, মিম ৭। মিজোরামে মোট আসন ৪০। ম্যাজিক ফিগার ২১। আসন পেয়েছে জেডপিএম ২৭, এমএনএফ ১০, বিজেপি ২টি।

এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে বিজেপি এককভাবে তিনটি রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে আর মিজোরামে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে জেডপিএম।

ভোটের আগে থেকে রাজনৈতিক দলগুলো পাঁচ রাজ্যের ভোটকে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের সেমিফাইনাল বলে বর্ণনা করেছিল। সেই হিসেবে বিজেপি ৩-২ ম্যাচে সেমি ফাইনাল জিতে গিয়েছে। বিজেপিকে হারানোর জন্য যারা উঠে পড়ে লেগেছিল তাদের প্রত্যেকের মুখে এখন তালা লেগে গেছে। আর তাদের সেই তালা লাগা করুণ চোখ-মুখের দৃশ্য দেখে দেশের আমজনতা আনন্দে আটখানা। এবারের গেরুয়া ঝড়ে যাকে বলে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে অন্য দলগুলো। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আবারও জিতে বিজেপির হ্যাটট্রিক করাটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন রাজনীতিক এবং সাধারণ মানুষ।

প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন যজ্ঞ, জনপ্রিয়তা, ক্যারিশমার ধারে-কাছে নেই বিরোধী জোটের রাহুল গান্ধী-সহ আর কোনো নেতা। ভারতবাসীর হৃদয়ে নরেন্দ্র মোদী কতটা স্থান জুড়ে রয়েছেন, সেটা পুনরায় স্পষ্ট হয়ে গেল এই ফলাফলে। এই ভোটে মধ্যপ্রদেশ নিজেদের দখলে রাখার পাশাপাশি রাজস্থান ও ছত্তিশগড় কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানায় জিতে কিছুটা মুখরক্ষা করেছে কংগ্রেস। তবে সেখানেও গতবারের চেয়ে অনেক ভালো ফল করেছে

বিজেপি। এই ফল প্রকাশের পর বর্তমানে একককভাবে বিজেপির দখলে রইল ১২টি রাজ্য আর কংগ্রেসের রইল মাত্র ৩টি রাজ্য।

তিন রাজ্য জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী বিজেপির সদর দপ্তরে এসে সদ্য নির্বাচন হওয়া রাজ্যগুলোর মানুষকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি কংগ্রেসকে সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'ভারতের মানুষ স্থায়ী সরকার চান। স্থায়িত্ব চান সবাই। ভারতের কোনো নাগরিক আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় পিছিয়ে পড়বেন না। দেশের সেবা করার জন্য দেশের মানুষের সেবা করতে হয়। অহংকার, নেতিবাচক কাজকর্মকে সংবাদমাধ্যম হেডলাইন দিতে পারে কিন্তু তা জনতার মনে স্থান পায় না। নতুন প্রকল্প হলে কংগ্রেস ও তার সঙ্গীরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। তাই বলছি আপনারা শুধরে যান। নাহলে জনতা আপনাদের সাফ করে দেবে। এই হ্যাটট্রিক (তিন রাজ্যে জয়) চব্বিশের হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি। মনে রাখবেন, দেশবাসী শুধু উন্নয়নের উপর বিশ্বাস রাখেন। আমরা সেটাই করে যাচ্ছি আর করেও যাব।' তিনি আরও বলেছেন, 'এ নতুন ভারত। নতুন গতি। নতুন সংকল্প। দেশবাসী, আপনাদের স্বপ্নই আমার সংকল্প। ওই সংকল্প আমার তপস্যাও। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির লড়াইয়ে প্রচুর জনসমর্থন মিলেছে। ভোটাররা জানিয়ে দিয়েছেন, দুর্নীতিগ্রস্তদের পাশে তাঁরা নেই। কেন্দ্রীয় এজেন্সির যাঁরা দুর্নাম করেন, তাঁদের পাশে মানুষ নেই। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটে জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগাভাগির চেষ্টা করেছিল বিরোধীরা। আমি তা হতে দিইনি। জনতা জনার্দনও জাতপাতের রাজনীতি নস্যাৎ করেছেন।'

এবারের ভোটে সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের তা হলো পুনরায় বামেদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। এই ভোটে নোটা-র থেকেও কম ভোট পড়েছে বামেদের থলিতে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ছত্তিশগড়ে সিপিআই পেয়েছে ০.৪১ শতাংশ ভোট, সিপিএম পেয়েছে ০.০৪ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ মাওবাদী অধ্যুষিত বলে পরিচিত রাজ্যে বামেদের ভোট মাত্র ০.৪৫ শতাংশ। যেখানে ছত্তিশগড়ে নোটায় ভোট পড়েছে ১.২৮ শতাংশ। একইভাবে মধ্যপ্রদেশে বামেরা মিলে পেয়েছে ০.০৪ শতাংশ, সেখানে নোটা পেয়েছে ০.৯৯ শতাংশ। তবে রাজস্থানে নোটা পেয়েছে ০.৯৭ শতাংশ আর দুই বাম মিলে পেয়েছে ১.০০ শতাংশ। আবার সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরির রাজ্যে নোটার কাছে হেরেছে বামেরা। সেখানে নোটা পেয়েছে ০.৭২ শতাংশ আর দুই বাম পেয়েছে ০.৬১।

বামেদের এরকম করুণ অবস্থা হবে নাই-বা কেন? এদের দলের জন্মের পর থেকে এরা নিজের দেশের সঙ্গে, দেশবাসীর সঙ্গে বিশেষ করে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। তেমনি হিন্দু ধর্মকে বারবার অপমান করেছে, আঘাত হেনেছে। হিন্দুরা সহ্যশীল বলে অসম্ভব ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে এসেও এখন তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে বামেদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এটা একদিকে হিন্দুদের পক্ষে যেমন শুভ লক্ষণ, তেমনই বামেদের কাছে অশনি সংকেত।

তবে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে একটা জিনিস ভালোভাবে প্রমাণ হলো যে, 'বাংলা সবার চেয়ে এগিয়ে।' বহু বছর আগে গোপালকৃষ্ণ গোখলের সেই অমোঘ বাণী— 'বঙ্গ আজ যা ভাবে, ভারত তা ভাবে আগামীকাল এবং বিশ্ব ভাবে পরশু।' তাঁর এই বাণী অন্যভাবে প্রমাণ হলো। যেমন— পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত, সমবায় এমনকী স্কুল কমিটির নির্বাচনেও যেখানে ধমকি-চমকি, লাঠি-সোটা, গুলি, বন্দুক, বোমার যথেচ্ছ ব্যবহার করে হিন্দুদের মেরে ফেলে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, হিন্দুর বাড়ি লুটপাট করা, অগ্নিসংযোগ করা প্রভৃতি মহান কাজের যে প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তা কিন্তু ওই রাজ্যগুলো দেখাতে পারল না। আবার ভোটের ফল ঘোষণার পর ক্ষমতায় ফিরে এসেও বিরোধী তথা হিন্দু নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, জখম, লুটপাট, গৃহদাহ করে বাড়িছাড়া, গ্রামছাড়া, এমনকী রাজ্যছাড়া করার অধিকার মেলে, সেসমস্ত বিষয়গুলো অন্য রাজ্যগুলি এখনও শিখতে পারল না। তাই অনেকেই এখন দুঃখ করে বলছে না, বিধানসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভোটের আগে-পরে সেখানে গুলি, বন্দুক, বোমার শব্দ নেই, বিরোধীদের কান্নার রোল নেই, নারীধর্ষণ নেই, হত্যা নেই, লেলিহান অগ্নিশিখার দহন নেই, গাছে ঝোলানো নেই, গ্রামাছাড়া, রাজ্যছাড়ার খবর নেই, মুখ্যমন্ত্রীর হুংকার— 'মাদ্রাসার ছেলেদের লাগিয়ে দাও, ওরা খুব সাহসী'-র মতো নিদান নেই, সেইসব রাজ্যের 'নিরামিষ' ভোটপর্ব পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলকে একেবারে আশাহত করে ছেড়েছে।

সে কারণে অন্য রাজ্যের বিজেপি বিরোধী দলগুলোর নেতাদের এরাজ্যে এসে কীভাবে ভোটে জেতা যায় তার শিক্ষা নিয়ে যাওয়া। নতুবা তাদের নিজ নিজ রাজ্যে যে কোনো ভোটের আগে দলের কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের থেকে প্রশিক্ষক নিয়ে গিয়ে দলের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে ভোটে জিততে অসুবিধা না হয়।

অনেকের হয়তো এখনো মনে রয়েছে যে— বিজেপির এক প্রাদেশিক নেতা কয়েক বছর আগে নদীয়া জেলার করিমপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর সেখানে ভোট প্রচারে গেলে রাজ্যের দুধেল গোরুরা কীভাবে তাঁকে পদাঘাতের মাধ্যমে রাস্তার ধারের জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিল। সেই সম্মান প্রাপ্তির পরেই বিজেপির সেই নেতা এখন শাসক দলের একনিষ্ঠ সেবক এবং বিজেপি বিরোধী একজন ভালো বক্তাও।

তেমনি আর একটি দৃশ্যও হয়তো অনেকে ভুলে যাননি। সেটি হলো কোনো একদিন প্রকাশ্য রাস্তায় এক দুধেল গোরুর উড়ন্ত লুঙ্গির ছুটন্ত পদাঘাত এসে পড়ল কর্তব্যরত পুলিশের পশ্চাদ্দেশে। কিন্তু তার পরেও সেই পুলিশ কিংবা পুলিশ সমাজ বা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তা, কারও ক্ষমতা হয়নি ওই দুধেল গোরুর শাস্তির দাবি তোলা বা শাস্তি দেওয়ার। তাই এ রাজ্যের অনেকেই বলছেন, অন্য রাজ্যের বিজেপি বিরোধী দলগুলোর নেতাদের উচিত এ রাজ্যে এসে ভোটে জেতার কৌশল রপ্ত করে যাওয়া।

আগামী লোকসভা নির্বাচনেও দেশ যে একটি স্থিতিশীল সরকার পেতে চলেছে, তা বুঝিয়ে দিল এই নির্বাচনী ফলাফল। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও আস্থাশীল তা প্রকাশ হলো এই রায়ে।

একমাত্র স্থায়ী সরকারই পারে দেশের জন্য একটি সুষ্ঠু আর্থিক ও বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে, যা দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে। এর ফলে মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণ ব্যবস্থার মতো জনকল্যাণমুখী কাজে সরকার আরও বেশি নজর দিতে পারে। উপকৃত হয় দেশের সাধারণ মানুষ। যার জন্য নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আর্থিক নীতির সুফল পাচ্ছে দেশবাসী। এজন্য নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রতিই যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনোও আস্থাশীল, তা পুনরায় বুঝিয়ে দিল ওই রাজ্যগুলোর ভোটের ফলাফল। □

ভারতবাসীর বিশ্বাস আর ভরসার নাম নরেন্দ্র মোদী

প্রদীপ মারিক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেখিয়ে দিলেন দেশবাসীর সঙ্গে থাকার জন্য বিরোধীদের মতো ফাঁকা মুখের বুলি দিলে হয় না; কাজ করে দেখাতে হয়। দেশের মানুষই বলবে বিশ্বাস করি আপনাকে, বিশ্বাস রাখি আপনার প্রতি। কারণ আমরা জানি বিপদে মোদী সরকারই আমাদের পাশে থাকবে। উত্তরকাশীতে সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকদেরও মনের বল ছিল, মোদীজীর প্রশাসন তাদের রক্ষা করবে। দেশে যখনই প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিস্থিতি হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সে মহামারী কোভিড পরিস্থিতি হোক কিংবা ইজরায়েল- হামাসের যুদ্ধই হোক না কেন। তিনি একবারে তৃণমূল স্তরে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝে সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে প্রত্যেক ভারতবাসীর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। কোভিড পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটা গরিব মানুষের জন্য বিনামূল্যে রেশন চালু করলেন; চালু করলেন উজ্জ্বলা যোজনা, বিশ্বকর্মা যোজনা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ন্যাশনাল স্কলারশিপ ছাড়াও পড়ুয়াদের জন্য এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা। মহিলাদের আর্থিক ভাবে উন্নত করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছেন। আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদী জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্র সরকার দেশে ২ কোটি 'লাখপতি দিদি' বানাতে চান। এবার সেই লক্ষ্য দেশের মহিলারা যেন ড্রোনকে ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক লাভের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন করেন। এই লক্ষ্য নিয়ে নতুন একটি প্রকল্প চালু করা হলো। প্রধানমন্ত্রী এর নাম দেন 'নমো ড্রোন দিদি'। তিনি যে দেশবাসী সঙ্গেই আছেন। সুখে-দুঃখে।

এই বিশ্বাস ছিল সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকদের, তাদের ভরসা নরেন্দ্র মোদী। তাদের সেই বিশ্বাস আর ভরসার মর্যাদা দিয়েছে মোদী সরকার। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল দেখিয়ে দিল তৃণমূল স্তরের প্রত্যেক মানুষের ভরসার স্থায়ী ঠিকানা মোদীজী

এবং তাঁর সরকার। প্রধানমন্ত্রী দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য গঠন করলেন 'মেরা যুবা ভারত' প্রকল্প। যেখানে দেশের সকল যুবক-যুবতী নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। My Bharat.Gov. in এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। নরেন্দ্র মোদী বললেন, 'My Bharat ওয়েবসাইটযুবসমাজকে দেশ গঠনের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ দেবে। এটা একটা অভিনব প্রচেষ্টা যেখানে ভারতের যুবসমাজকে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে শামিল করা হবে।'

ভারতে বসবাসকারী ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যার গড় বয়স ৩৫ বছরের কম। সুতরাং তাদের স্বাবলম্বী করতে হবে। এটাই তো প্রত্যেক যুব ভারতবাসী প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা করেন। তাদের আশা ভরসার মর্যাদা দিতে জানেন মোদীজী। তার ফল পাওয়া গেল সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে। রাজস্থানে ক্লিনসুইপ করলো বিজেপি। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিজেপি। জয়পুরে সর্দার পটেল মার্গে রাজস্থানের রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত। দিয়া কুমারী ও বসুন্ধরা রাজে দুজনেই একেবারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মোদীজীর স্বপ্নের ভারত গড়তে রাজস্থানের মানুষদের পাশে পেয়েছেন। তাদেরকেই রাজস্থানের মানুষদের জন্য কেন্দ্র সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। বুথ ফেরত সমীক্ষায় যে আভাস থাকুক, আবার একবার মধ্যপ্রদেশে বিজেপির সরকার দুই তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করলো। আত্মবিশ্বাসী ছিলেন শিবরাজ সিংহ চৌহান। মধ্যপ্রদেশের মহিলাদের থেকে বিজেপি যে ধরনের সমর্থন পেয়েছে, তাতে এই অভূতপূর্ব ফল।

স্বাধীনতার এই অমৃতকালে প্রত্যেক দেশবাসীকে উন্নত করে তোলার সংকল্প নিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ সরকার। ভারতকে বিদেশ থেকে পেট্রল, ডিজেল তো আমদানি করতে হয়, বিভিন্ন পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যের জন্যও অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বীণা রিফাইনারিতে যে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের শিলান্যাস হয়েছে, তা ভারতকে এধরনের পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করে তুলবে। কিছু বছর পর এই বীণা রিফাইনারিতে কাজ শুরু হলে পেট্রোকেমিকেল জাতীয় বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে ভারতবর্ষ স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। এবারে ছত্তিশগড় বিধানসভা ভোটের সময়ই মহাদেব বেটিং অ্যাপস্ কেলেঙ্কারিতে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের নাম জড়ায়। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে শেষ মুহূর্তে জোরকদমে প্রচারে নামে বিজেপি। নির্বাচন কমিশনের কাছেও তদন্তের দাবি জানায়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেন ভূপেশ বাঘেল। তবে ভোটের সময় এই ধরনের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়ে কংগ্রেস। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ছত্তিশগড়ের মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলে একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিল, আঞ্চলিক দলের ওপর মানুষের আর ভরসা নেই। একমাত্র ভরসার জায়গা নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সরকার। নির্বাচনে শেষ কথা দেশের জনগণ। জনগণের রায় নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের সঙ্গে, বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে। □

কেন আবার রাষ্ট্রীয় সংগীত?

আবার নতুন করে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় সংগীত। রাজ্যে রাষ্ট্রীয় সংগীত! যা কখনো ভাবা যায় না, তাই এখন চালু করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। জাতীয় সংগীত 'জনগণ মন অধিনায়ক'র পাশাপাশি কেন এই রাষ্ট্রীয় সংগীত? পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে চলে যাচ্ছে? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান 'জয় বাংলা' এখন পশ্চিমবঙ্গে শাসকশ্রেণীর মুখরোচক স্লোগান হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের নায়ক মুজিবুর রহমান এই স্লোগানের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই দেশের স্লোগান কেন পশ্চিমবঙ্গে? কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এখানে? আগামীদিনে জাতীয় পতাকার পরিবর্তে রাজ্য পতাকা উড়বে নাকি এখানে ঠিক যেমন কাশ্মীরে ছিল? এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব আগামীদিনে ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে না তো? জাতীয় সংহতির পরিপন্থী এই এই মনোভাব। জাতি ও জাতীয় সংগীতকে অবমাননার শামিল। জাতীয় সংঙ্গীতকে নিয়ে এভাবে কখনো ছেলেখেলা করা যায় না।

সংবিধানের শপথ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এখন সংবিধানকে ধ্বংস করছেন। জাতীয় সংগীতকে অপমান করার জন্যে রাজ্যের জনগণকে গর্জে ওঠা দরকার। বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদের মতো এই রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সংগীতের বিরুদ্ধে সর্ব স্তর থেকে তীব্র প্রতিবাদের আওয়াজ উঠুক। এ ব্যাপারে কেন্দ্রও নীরব থাকতে পারে না। জাতীয় সংগীতকে নিয়ে এভাবে কখনো ছেলে খেলা করা যায় না। জাতীয় সংগীত অবমাননার দায়ে মামলা করা দরকার। এই ছদ্মবেশী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। জাতীয় সংহতির সঙ্গে কখনো আপোশ করা যায় না। আমরা নতুন করে আর একটা কাশ্মীর চাই না।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ফারাক্কায় মিছিল

কয়েকদিন আগে কার্যোপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কায় গিয়েছিলাম। দেখলাম রাস্তায় রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের বেশ বড়োসড়ো মিছিল চলছে। মিছিলে স্লোগান ছিল একশোদিনের টাকা কেন্দ্রকে দিতে হবে। আমার সঙ্গে ছিলেন ফারাক্কারই এক বন্ধু। সে বলল, দেখ, মিছিলে কোনো ভালো লোক নেই। নেতা যাদের দেখা যাচ্ছে তারা সবাই বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। মিছিলের বেশিরভাগই লোকই গ্রামের গরিব মানুষ। তারাও বিভিন্ন সমাজ বিরোধী কাজে যুক্ত।

আমার মনে হচ্ছিল, বর্তমান শাসকদল শুধু দুর্নীতিবাজদের দল নয়; দুর্বৃত্তদেরও দল।

—সমীর হালদার,
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

সময়োপযোগী সংখ্যা

স্বস্তিকা পত্রিকার গত ৪ ডিসেম্বরের সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী সংখ্যা। শীতকালে নিজেকে ও পরিবার-পরিজনদের সুস্থ রাখার বিষয়ে সাতটি বিশেষজ্ঞের বিস্তারিত পরামর্শ রয়েছে, যা পাঠ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষও লাভান্বিত হবেন। তাছাড়াও বাঙ্গালি বিপ্লবীদের স্মৃতিতর্পণ বিষয়ে পাঁচটি লেখা রয়েছে। খুব ভালো লাগল যে, বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের নাতি বিশ্বরঞ্জন দাস তাঁর দাদুর স্মৃতিচারণ করেছেন।

বিশ্বরঞ্জনবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ দাস অর্থনৈতিক জেহাদ সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করেছেন। তাঁকেও নমস্কার। এক কথায় সংখ্যাটি বিভিন্ন তথ্যে সমৃদ্ধ। সম্পাদকীয় বিভাগকেও ধন্যবাদ।

—সুপ্রতীম দাস,
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

উত্তরবঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে

বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে ক্রমশ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। বাংলাদেশি মুসলমানরা কর্মসংস্থান, চিকিৎসা-সহ আরও অন্যান্য কারণে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের নজর এড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে এবং এদের অধিকাংশই আর বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে না। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। এ কারণে সেখানে বসবাসকারী স্থানীয় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাচ্ছে এবং সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এদের অনেকেই আবার নিরাপত্তার কারণে নিজেদের বাসস্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে চলে যাচ্ছেন। প্রশাসন এসব বিষয়ে নির্বিকার। শোনা যায় পুলিশ প্রশাসনের অনেকটাই এইসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কীভাবে এটা সম্ভব জানা নেই। ফলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানরা হিন্দুদের ফাঁকা বাড়ি বা জমিতে বসবাস করতে শুরু করে আর পরবর্তীকালে তারাই সেগুলির মালিক হয়ে যায়। এর ফলে উত্তরবঙ্গের ওইসব এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ক্রমশ ঘটছে আর স্থানীয় হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে এক থানায় সম্ভবত কালিয়াচক থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ করা হলে সেখানকার থানা ইনচার্জ বলেছিলেন বেশ তো আপনারাও মুসলমান হয়ে যান না কেন? আমার প্রশ্ন, প্রশাসনের মদত ছাড়া এদের এত সাহস হয় কীভাবে?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

ফঃ ৩

চোদ্দতম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মমতাজের মৃত্যু হয়

আগ্রার তাজমহল দেখে যাদের মন প্রেমে হাবুডুবু খায়, তাদের জন্য স্বনামধন্য স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাঃ সি.এস.দাঁ-র সাবধান বাণী —'কোনো দম্পতি যখন দুটোর বেশি সন্তান গ্রহণ করতে যাবেন, তখন অবশ্যই একবার তাজমহলের কথা স্মরণ করবেন।' একথা তিনি তাঁর লেখা 'সুখী জীবন' বইয়ে তৃতীয় সংস্করণের ১০৫ পাতায় উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি ভারতবর্ষের অনেক ঐতিহাসিক তাজমহলকে আমাদের কাছে প্রেমের স্মারক চিহ্ন বা স্মৃতিসৌধ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাজমহলের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন বাদশা শাহজাহানকে। তিনি নাকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমিকপুরুষ ছিলেন। তাঁর মতো প্রেম কারও হৃদয়ে কখনোই উদিত হতে পারে না। তিনি তাঁর নিজ স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি প্রেমের নমুনা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন এই তাজমহল। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল আর্জুমান্দ বেগম। ডাকনাম ছিল মমতাজ।

মুঘল বাদশা শাহজাহান তাঁকে নিকা করেছিলেন ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে। মমতাজের মৃত্যু হয় ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে। মমতাজ তাঁর এই ১৮ বছরের বিবাহিত জীবনে ১৪টি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন এবং এই চোদ্দতম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। তৎকালীন কয়েকজন বৈদ্যের নিষেধ সত্ত্বেও শাহজাহান মমতাজের গর্ভে চোদ্দতম সন্তান এনেছিলেন। সেই কারণে ডাঃ সি.এস.দাঁ-র এই সাবধান বাণী। কী মনে হয়? বাদশা শাহজাহান মমতাজকে এতটাই ভালোবাসতেন? তাঁর শরীর, মন, প্রাণ সম্পর্কে যে কোনোই খেয়াল রাখতেন না? আসলে তিনি ছিলেন একজন চরিত্রহীন নারীশরীর লোলুপ। বাদশা হিসেবে নিজ স্ত্রীর মৃত্যুরহস্য ঢেকে দিতে প্রচার করিয়েছিলেন, তিনি একজন প্রেমিক পুরুষ।

তিনি নাকি মমতাজের প্রেমে পাগল ছিলেন। আসলে মমতাজের শরীর ভোগ করার জন্য তিনি পাগল ছিলেন। এই নির্মম কলঙ্ক চাপা দিতে তাজমহল তৈরির গল্প ফেঁদেছিলেন। যিনি নিজের বড়ো ভাই খসরুকে গলা টিপে হত্যা করেছিলেন। ছোটো ভাই শাহরিয়ারকে জলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। বাদশা হবার পথ পরিষ্কার করতে তাঁকে এসব করতে হয়েছে? তিনি একজন প্রেমিক পুরুষ? শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষক ঐতিহাসিক মোল্লা আব্দুল হামিদ লাহোরি তাঁর 'বাদশানামা' গ্রন্থে মমতাজ বেগমের সমাধি সৌধ তথা তাজমহল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— 'রাজা মানসিংহ-র সুরম্য উদ্যান ঘেরা গম্বুজ শোভিত এক বিশাল প্রাসাদ ছিল আগ্রা শহরের দক্ষিণে। মানসিংহের পৌত্র রাজা জয়সিংহের কাছ থেকে বাদশা শাহজাহান সেটি অধিগ্রহণ করে সেটিকে সমাধি স্তম্ভে রূপান্তরিত করেছিলেন। রূপান্তর করতে ব্যয় হয়েছিল ৪০ লক্ষ টাকা'।

মমতাজের মৃত্যু হয়েছিল ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে অস্থায়ীভাবে বুরহানপুরে কবর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে থেকে তাঁর মরদেহ তুলে এনে আগ্রায় রাখা হয়েছিল। পরের বছর জয়সিংহের প্রাসাদে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। মমতাজকে যে তিনি শুধু ভোগের বস্তু ভাবতেন, তাঁর প্রমাণ মমতাজ ছাড়াও সেই সৌধের ভিতর তাঁর অন্য দুই স্ত্রী কান্দাহারি মহল, সরহিন্দ্ বেগম এবং এক খাস পরিচারিকার দেহও কবরস্থ করা হয়েছিল। শাহজাহান ছিলেন প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী শাসক। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রত্রেয় বংশের রাজা পরমার্দিদেব কর্তৃক স্থাপিত শ্বেতপাথরের 'তেজো-মহা-আলয়' নামে এক বিরাট শিব মন্দির (রাজা মানসিংহের অধীনে ছিল) রাজা জয়সিংহের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে মমতাজের মৃত্যু রহস্য চাপা দেওয়ার জন্য শাহজাহান মমতাজের সমাধিস্থল বানান। আজ যেটা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য, 'তাজমহল'। যেটি এক সময় ছিল হিন্দু মন্দির 'তেজো-মহা- আলয়'।

—মানস বন্দ্যোপাধ্যায়,
জগমোহনপুর, হরিপুর, হুগলি।

পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব আইন লাগু হওয়া প্রয়োজন

সকলেই জানেন পশ্চিমবঙ্গ বহুদিন ধরে অনুপ্রবেশ সমস্যায় জেরবার। অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বাম আমলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু ভোটব্যাংকের কথা ভেবে পার্টি নেতৃত্বের চাপে তিনি তা থেকে সরে আসেন। মাদ্রাসা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ওগুলি সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর। তাতেও তিনি ঢোঁক গিলেছিলেন।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। বামেদের ভোটব্যাংক ভাঙতে তিনি অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বিতাড়নের কথা বলেছিলেন। এখন কংগ্রেস-বাম- তৃণমূল সবাই অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে গলা ফাটাচ্ছে। নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জির শাসনকালেই অনুপ্রবেশকারী জেহাদিরা এই রাজ্যে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করেছে। একজনের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সেদিক দিক দিয়ে অসম রাজ্য অনেক সচেতন। তারা নাগরিকত্ব আইন লাগু করতে চলেছে। সুখের বিষয় যে, ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই চন্দ্রচূড় প্রশ্ন তুলেছেন, অসমে নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হলেও পশ্চিমবঙ্গে নয় কেন? সুপ্রিম কোর্ট এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হলফনামাও দাবি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন, নাগরিকত্ব আইনের বিপক্ষে এই রাজ্যের শাসকদল, বামেরা ও কংগ্রেসও। সুতরাং রাজ্যে পালাবদল না হলে নাগরিকত্ব আইন লাগু করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। আগামী বিধানসভা ভোটে পালাবদল না করতে পারলে এই রাজ্য দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

—শুভাশিস বিশ্বাস,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

আইনে নারীর অধিকারের পরিধি

অরুণা মুখোপাধ্যায়

অধুনা শহরে বহু নারীকণ্ঠ উচ্চস্বরে বলে থাকেন, "এখন আমাদের মেয়েদের যুগ— আমাদের অধিকারও অসীম। বিয়ের আগে সকাল ৯টায় যেমন ঘুম থেকে উঠতাম, বিয়ের পরেও ঠিক সেই অভ্যাসই পালিত হবে। আমার মতো নববধূর দ্বারা এর ব্যতিক্রম ঘটানোর চেষ্টা করার ইঙ্গিত পেলেই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ (ক) ধারার প্রয়োগ ঘটাবো মানসিক অত্যাচারের কারণের ভিত্তিতে, যেটা তারা মূক-বধির হয়ে থাকলেও আইনের অপপ্রয়োগ ঘটানো আমাদের কাছে খুব সহজ।" ৫০ বছরের দীর্ঘ আইনজীবন কাটিয়ে এক এক সময় মনে হয়েছে আমাদের সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের একি অবস্থা— যেখানে স্নেহ, মায়া, ভালবাসায় ঘেরা নারীজীবনের, সাধিকা জীবনের প্রতিমূর্তি ছিলেন মা-সারদা, গৌরীমাতা সাধু মায়েদের আদর্শ নারীমূর্তি।

আজকের দিনে বহু মেয়েই আদর্শ, কর্তব্য, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে বেপরোয়া চালচলনে অশালীন ভাবভঙ্গিতে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ও আগেকার দিনের মতো যেমন সেই রামও নেই, রাজত্বও নেই— ঠিক তেমনি আদর্শনিষ্ঠ বাবা মায়েদেরও সংখ্যা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। চকোলেট, বিস্কুট খাওয়ার আনন্দের মতোই তাদের জিহ্বা সততই লালসাযুক্ত হয়ে আছে ডিভোর্স করার দিকে, মিথ্যা মামলার অপপ্রয়োগে ৪৯৮ (ক) ধারার প্রয়োগের প্রতি ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভরণপোষণের প্রয়োজন না থাকলেও তারা অর্থের লালসায় ছুটে চলেন ভরণপোষণ পাবার উদ্দেশ্যে।

বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো আধুনিক যুগের নারীদের, মায়েদের কল্যাণের জন্য আইনে নারীর অধিকারের পরিধি কতটা পর্যন্ত আইনসম্মত সে বিষয়ে বোধগম্য করা — যাতে তাঁদের কর্তব্যের পরিধি বিস্মৃত না হয়ে যায়। প্রথমেই বলে রাখি, আইনের মূল ও প্রধান কথাই হলো Rights and duties are correlative terms অর্থাৎ অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতীয় সংবিধানেও নারী ও পুরুষের লিঙ্গবৈষম্য দূর করে সমানাধিকারের কথা স্বীকৃত হয়েছে। সেজন্য নারী ও পুরুষের পারস্পরিক কর্তব্যবোধ ও অধিকারবোধ থাকা প্রয়োজন। নারীপ্রগতির যুগে বহু জনকল্যাণমূলক আইনের দ্বারা নারীর অধিকারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে— কিন্তু কর্তব্যবোধ আইনের দরবারে লিখিত না হলেও এটি ন্যায়নীতির প্রস্তরে লিখিত হয়ে আছে,

গীতার উক্তিতে আছে বিষয়াসক্ত মন প্রথমে বিষয়রস পান করে, পরিণামে কিন্তু এটি বিষতুল্য হয়। আইনজীবনে দেখেছি বহু মেয়েই নারী স্বাধীনতাকে নারীর স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত করে জীবনপথে বিশৃঙ্খল হয়ে চলে থাকেন। এই যে ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য প্রচেষ্টা এটি যদি কর্তব্যবুদ্ধি সম্মত হতো তাহলে সেই নারীর জীবনে ধ্বংস ডেকে আনতো না। অর্থাৎ বিবাহিত মহিলার উচিত স্বামী যদি অত্যাচারী না হন ও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হন, তাহলে ওই স্বামীর সঙ্গেই বাকি জীবন নীতিগতভাবে কাটানো ও অন্য পুরুষ প্রেমিকের প্রতি ভোগলালসা বিসর্জন দেওয়া। অনেক সময় মেয়েদের বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলাদের তার বৃদ্ধ শ্বশুর ও অসুস্থ বৃদ্ধা শাশুড়ির প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্যবাণ প্রয়োগ করতেও দেখেছি। শ্বশুর শাশুড়ি তাঁদের নিজেদের বাড়িতে বাস করা সত্ত্বেও বিবাহিতা বধূ অবজ্ঞাসূচক ভরে বলে ওঠেন— 'বৃদ্ধ বয়সে আর কতদিন বাঁচবেন'। ভাবতে কষ্ট হয় যে কর্তব্যবোধ হারিয়ে বধূরা যদি ভাবেন যে অধিকার তাদের অসীম, তাহলে আইনগত ভাবে আদালতেও কিন্তু এই পুত্রবধূদের পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেহেতু শ্বশুরবাড়িতে পুত্রবধূ বিশেষ যত্ন ও আদর সহকারেই জীবন কাটাতেন। অনেক বধূমাতাকে দেখেছি ভরণপোষণ পাবার আগ্রহে ও লালসায় ছয় মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে শ্বশুরবাড়িতে ফেলে বাপের বাড়িতে দিনের পরদিন বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন। সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার বাবা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা প্রাণ দিয়ে আঁকড়িয়ে মানুষ করে তুলেছেন ও বধূমাতা নিজেই লিখে দিয়ে গেছেন কোনওরকম অশান্তি না থাকা সত্ত্বেও তিনি শিশুর ভার বহন করতে নারাজ এবং সেইসময় একটি অবিবাহিত পুরুষ বন্ধুও তার প্রতি আসক্ত হয় ও সন্তানসহ তাকে বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বধূটিও শিশুর দিকে ফিরে তাকায় না। শিশুটির পিত্রালয় থেকে ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময়ে শিশুটিকে তার মনের ভাব জানবার জন্য তার বাবা, ঠাকুমা ও ঠাকুর্দা যখন জিজ্ঞাসা করতেন— "তুই তোর মায়ের কাছে যাবি?" শিশুটি চোখ বড়োবড়ো করে রাগত ভরে বলতো— "একদম যাব না। আমার মা তো তুমি", ঠাকুমাকে দেখিয়ে বলতো। শিশুর ঠাকুমা, ঠাকুর্দা ও মা বহু আদর যত্নে শিশুকে আজও বড়ো করে তুলেছেন। উপরোক্ত ঘটনাগুলো দেখলে মনে হয় নারীর অধিকার আছে ঠিকই, কিন্তু যে অধিকার মানবাধিকারের ন্যায় নীতির কষ্টিপাথরকে উপেক্ষা করে হয় না, অর্থাৎ কর্তব্যবোধহীনতা মায়ের জীবনে ঘটলে যেটিতে অধিকার বোধের ছাপ পরিস্ফুট হয় না ও ন্যায়নীতির বিচারে সেই মানুষটিকে অর্থাৎ তিনি নারীই হন বা পুরুষই হোন পরাজয় তাকে মেনে নিতেই হবে।

আমার মনে হয়, শুধু মাত্র আইনজীবীর দৃষ্টিতে নয়, ঈশ্বরের তুলাদণ্ডে তার যে ন্যায়বিচার হবে সেটিতে তার নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে। সারদা মায়ের উক্তি দিয়ে বর্তমান নিবন্ধটি শেষ করছি, সেটি হলো— "যদি শান্তি পেতে চাও, কারোর দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। তবেই শান্তি পাবে।" নারীজাতির আদর্শ হলেন মা সারদা। তাই সারদা মাকে প্রণাম করে নারী জাতির শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য প্রার্থনা করছি। ❑

বিশ শতকের বিষ বুলি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

যে মায়ে দেয় বুকের দুধ
ক্যানসারে তার নাহি দুঃখ।
ঘন ঘন মার বাচ্চা হলে
ক্যানসার হয় অবহেলে।
মায়ের বুকে শক্ত ডেলা
ক্যানসারের পাবে ঠেলা।
বেশি বয়সে ক্রনিক কাশি,
ক্যানসার আসে হাসি হাসি।
খুস্ খুসে জ্বর নাহি ছাড়ে,
ক্যানসার থাকে আড়ে আড়ে।
খাওয়ার রুচি হঠাৎ কমে,
ক্যানসারের কথা ভাব মনে।
জ্বর কাশি আর বুকে ব্যথা,
টি.বি. ক্যানসারে কয় কথা।
ধূমপানেতে স্বর্গ সুখ
ক্যানসারের উৎস মুখ।

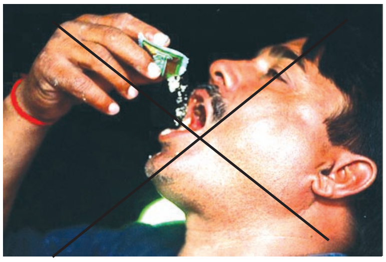

খৈনি, দোক্তা আর জর্দা,
ক্যানসারের তিন দাদা।
ধোঁয়া ছাড়ে যানবাহন,

ক্যানসারের সাতকাহন।
কলকারখানায় ছড়ায় গরল,
ক্যানসারের বিষ ছোবল।
খাবারে যতই পড়বে রং
ক্যানসার তত দেখায় ঢং।
তেল মশলা কড়া খাবার,
ক্যানসার ডাকে বার বার।
ড্রাগের নেশা সর্বনাশা,
ক্যানসারের নিত্য বাসা।
প্রত্যহ যার মদের নেশা,
ক্যানসারে তার নাই যে আশা।
সব অসুখে আছে ঠাঁই,
ক্যানসারেতে নাই রেহাই।
প্রথমেতে যদি পড়ে ধরা,
ক্যানসারের তবে হয় সারা।

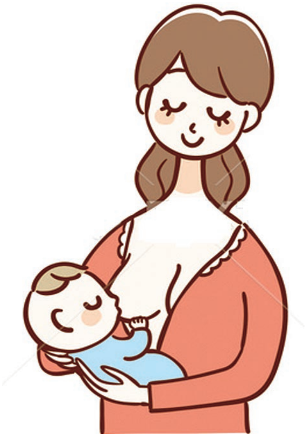

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

হরে কৃষ্ণ হরে হরে গীতা পাঠ ঘরে ঘরে

শ্রীপাদ জগদার্তিহা দাস
(শ্রীধাম মায়াপুর)

ঐতিহ্যশালী বঙ্গীয় সনাতন সংস্কৃতির নবজাগরণের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কারক হিতচিন্তক পরজন সুখের কাণ্ডারি মহাত্মা সন্তগণ গত বছরের ৫ ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এক ঐতিহাসিক সমবেত লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের।

এই মহাযজ্ঞের অগ্রণী সন্ত মহাত্মাগণ সমবেতভাবে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ সর্বানন্দ অবধূত, শ্রীমৎ প্রভানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ শ্রুতিশেখর গোস্বামী, শ্রীমৎ প্রকাশ ব্রহ্মচারী-সহ বিভিন্ন মঠ মন্দিরের মহাত্মা ও মঠাধ্যক্ষরা রচনা করলেন এক নবজাগরণ ও ইতিহাস।

পশ্চিমবঙ্গের সন্ত মহাত্মাগণ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ— এই ত্রিশক্তির যৌথ উদ্যোগে ২০২২ সালের ৫ ডিসেম্বর সুসম্পন্ন হয়েছিল এই ভগবতী কার্যক্রম।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক রমাপদ পাল-সহ অন্যান্য প্রচারক ও কার্যকর্তা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বরিষ্ঠ পদাধিকারী প্রচারক স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ দাস-সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সুধী নাগরিকগণ তাতে সমবেত হলেন।

গীতামঞ্চে সমাগত জীবন্ত কিংবদন্তী পণ্ডিত ড. শ্রীকুমার নাথ ভট্টাচার্যের মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে সূচনা হলো গীতাপাঠ মহাযজ্ঞ ইসকন শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচন্দ্রোদয় মন্দিরে।

ঠিক সকাল দশটা ছাব্বিশ মিনিটে অভিজিৎ নক্ষত্রে সূর্য ভগবানের রশ্মি থেকে পূত যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলন করে ইসকন গুরুকুলের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ভক্তি আর্যব প্রীতি বর্দ্ধন মহারাজা ও শ্রীপাদ কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ধর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রে ৯০০ বর্গফুট ক্ষেত্রে গীতাযজ্ঞের সূচনা করলেন। শ্রীমৎ শঙ্করানন্দের শঙ্খধ্বনি এবং তন্ত্রধারক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের নেতৃত্বে শতাধিক সন্ত মহাত্মা গীতাপাঠ আরম্ভ করলেন।

মোট পঁচাশি হাজার বর্গফুট ক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে উত্তরদিকে 'গীতা মঞ্চে' দেড় শতাধিক সন্ত মহাত্মা; পূর্ব দিকের 'শ্রীল প্রভুপাদ মঞ্চে' দেড় শতাধিক ইসকনের সন্ন্যাসী ও কার্যকর্তা, দক্ষিণে 'বসুধৈব কুটুম্বকম মঞ্চে' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং পশ্চিম দিকের 'সারস্বত মঞ্চে' সনাতনী বুদ্ধিজীবী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এবং গীতা যজ্ঞকুণ্ডের চারিধারে ৫০০০-এর বেশি, সাকুল্যে ৬২৩৭ জন সমবেতভাবে গীতাপাঠ করলেন।

ইসকনের আচার্য্য শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজ, ভব্য মন্দির অধিকর্তা শ্রীমৎ ব্রজবিলাস প্রভু ও শ্রীপাদ সুবেক্ষণা প্রভুর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই গীতা অনুষ্ঠান এক বিরাট আকার পরিগ্রহ করেছিল। অনুষ্ঠানের সমাপ্তির প্রাক্‌মুহূর্তে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ সমাপন ভাষণের দ্বারা ধর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ও দর্শনার্থী হাজার হাজার ভক্ত ও সনাতনীকে উজ্জীবিত, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলেন।

মহারাজ তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মহামহিম রাষ্ট্রপতির পেরিত সংকল্পপত্র পাঠ ও গীতা গ্রন্থকে আমাদের জাতীয় গ্রন্থ ঘোষণার দাবি প্রকাশ করলেন। ঘোষণা করলেন ২০২৪-এ ব্রিগেডে ১ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের।

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন নামের সমবেতভাবে হরিনাম সংকীর্তন, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর, ইসকন কেন্দ্র মায়াপুর থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বগ্রাহ্য গীতা জ্ঞানের বাণী সমগ্র বিশ্বে প্রচারের মহান যজ্ঞের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ ও বিশ্বের সনাতন ধর্মের নবজাগরণের শুভ সূচনা হয়েছে।

এই উপলক্ষ্যে ২০২৪-এর ২৪ ডিসেম্বরে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের নেতৃত্বে সাধু সমাজ, বিভিন্ন সংগঠন এবং এই রাজ্যের সন্ত মহাত্মাগণ এগিয়ে এসেছেন লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠকে সফল করতে। সেদিন উপস্থিত থাকার জন্য মহামহিম রাষ্ট্রপতি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিধানসভার স্পিকার-সহ রাজ্য বিধানসভার সমস্ত সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য এবং রাজ্যসভার সদস্য সদস্যাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। সকলের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হবে জীবনের পাথেয়— শ্রীগীতা।

(সহ সভাপতি, লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ সমিতি-২০২৪)

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

শ্রীঅরবিন্দের গীতা অনুধ্যান

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বঙ্গপর্বের সময় গীতা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি তখন সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে প্রকাশ করলেন 'গীতার ভূমিকা' সংক্রান্ত ধারাবাহিক কিছু লেখা। তা পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্টের তরফে ১৯২০ সালে। তখন তিনি পণ্ডিচেরীতে রয়েছেন।

বইটিতে কী আলোচনা আছে তা জানাই। গ্রন্থটির প্রস্তাবনা অংশ শুরু হয়েছে এইভাবে— 'গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক। গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই জ্ঞান চরম ও গুহ্যতম, গীতায় যে ধর্মনীতি প্রচারিত, সকল ধর্মনীতি সেই নীতির অন্তর্নিহিত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, গীতায় যে কর্মপন্থা প্রদর্শিত, সেই কর্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ।' লেখক গীতার গভীর সত্য উপলব্ধি করে যেটুকু কর্মপথে অভ্যাস করেছেন এবং বিচার ও বিতর্ক দিয়ে সেই অনুযায়ী অর্থ করেছেন, তা সার্বিকভাবে বিবৃত করাই প্রবন্ধগুলির বা প্রবন্ধ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বইটির প্রস্তাবনা অংশে তিনটি ভাগ— বক্তা, পাত্র ও অবস্থা। বক্তা হলেন শ্রীকৃষ্ণ; প্রস্তাবনার এই অংশে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে কর্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়দেহে ব্রহ্মজ্ঞানী হিসেবে দেখানো হয়েছে। শাস্ত্রে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানবদেহে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী লীলা করেছেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারতত্ত্ব প্রচারিত; দশম অধ্যায়ে বিভূতিতত্ত্ব অবলম্বনে ভগবান সর্বভূতে অধিষ্ঠিত, শক্তিবিকাশের সামর্থ্যে কতিপয় বিশেষ ভূতে কতকাংশে ব্যক্ত আর শ্রীকৃষ্ণ রূপে পূর্ণাংশে অবতীর্ণ।

প্রস্তাবনার 'পাত্র' অংশ আলোচনায় দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ-সখা মহাবীর অর্জুন গীতারূপ জ্ঞানের পাত্র, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাই, প্রিয় সখা, পরম হিতৈষী বন্ধু ও ভগ্নীপতি। ভগবান তাঁকেই গীতার পরম রহস্যের অমৃতবাণী শোনাবার জন্য বরণ করে নিলেন। সখা ও সহায় যিনি, তাঁরই কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করে যেন অর্জুন মানবজাতিকে তুলে দিলেন।

প্রস্তাবনার 'অবস্থা' অংশটি হলো কুরুক্ষেত্রের অতি-ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রারম্ভ। গীতোক্তির উদ্দেশ্য, কারণ ইত্যাদি বুঝতে গেলে তার কনটেক্সট জানা দরকার, কোন অবস্থায়, কোন পরিস্থিতিতে তা সংঘটিত হচ্ছে। অর্জুনকে দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত-জ্ঞান প্রকাশ করেছেন। স্থান যুদ্ধক্ষেত্র হলেও, মঞ্চ সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল হলেও, দেখা যাচ্ছে সেখানেই এর দীপ্ত-কথাচারণা। ভগবান কী, জগৎ কী, সংসার কী, ধর্মপথ কী, গীতায় তার সকল প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কর্মশিক্ষা হচ্ছে গীতার মূল উদ্দেশ্য।

গ্রন্থটিতে দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে যে যে বিষয়ে আলোচনা আছে তা হলো সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তি, দুর্যোধনের বাক্‌কৌশল, পূর্ব সূচনা, বিষাদের মূল কারণ, বৈষ্ণবী মায়ার আক্রমণ, বৈষ্ণবী মায়ার লক্ষণ, বৈষ্ণবী মায়ার ক্ষুদ্রতা, কুলনাশের কথা, বিদ্যা ও অবিদ্যা, শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ, শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, কৃপা ও দয়া, অর্জুনের শিক্ষাপ্রার্থনা, মৃত্যুর অসত্যতা, মাত্রা, সমভাব, সমতার গুণ এবং দুঃখজয় প্রসঙ্গ।

বইটির পরিশিষ্ট অংশে গীতার ধ্যান, সন্ন্যাস ও ত্যাগ এবং বিশ্বরূপ দর্শন (গীতায় বিশ্বরূপ, সাকার ও নিরাকার, বিশ্বরূপ, কারণজগতের রূপ এবং দিব্যচক্ষু) নিয়ে প্রবন্ধ সংকলিত রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন, 'গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মণি যদি সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধররা সর্বদা নূতন নূতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হৃষ্ট ও বিস্মিত হইবেন।' 'গীতার ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থের প্রস্তাবনায় রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন দ্বাপর ও কলিযুগের সংযোগস্থলে।

চতুর্যুগের মধ্যে কলিযুগ নিকৃষ্ট। কারণ এই যুগ মানুষের উৎকর্ষতার

শিল্পী : শুভরঞ্জন সাহা

প্রধান শত্রু পাপপ্রবর্তকের রাজ্যকাল, অবনতি ও অধোগতির রাজ্যকাল। কলিযুগ যেন জ্যোতিষবিদ্যার একটি গ্রহের দশা যা অন্য সকল গ্রহের অন্তর্দশাভোগ। কলির দশায় যেন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির আপন অন্তর্দশাভোগ। কলিযুগ উৎকৃষ্ট এ কারণেই যে, বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শক্তি বৃদ্ধি ঘটবে, জীর্ণ পুরাতন ধ্বংস হয়ে নতুনের আবির্ভাব ঘটবে। কলিকাল তাই নবায়নের কাল, নতুনের বীজ বপন ও অঙ্কুরোদগমের কাল। এই বীজ থেকেই মহীরুহ হবে সত্যযুগের বৃক্ষ। ঘোর অবনতির পরে উন্নতি চক্রগতিতে সম্পন্ন হবে, আর সেই সঙ্গে ভগবানের আপন অভিসন্ধিও সাধিত হবে। তাহলে যুগোপযোগী কী এমন আছে গীতাতে যা কলিযুগের পক্ষে ঋত ও সত্য? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি। গীতার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগ আগমনের উপযোগী গুহ্য জ্ঞান ও কর্মপ্রণালী রেখে গেছেন।' অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, গীতার বাণী হলো সত্যযুগের মহালয়া বা আগামনীবার্তা। সত্যের আগমনকালে গীতাধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার তাই অবশ্যম্ভাবী; গীতার বাণী পণ্ডিতদের ছাড়িয়েও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হবে।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ৪৬টি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ রয়েছে। তারপর আলোচিত হয়েছে সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তির বিষয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের কাছে যুদ্ধের খবর নিচ্ছেন। এই দিব্যচক্ষুর কথা আধুনিক ভারতের ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকের চোখে কবির কল্পনা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, 'যদি বলিতাম অমুক লোক দূরদৃষ্টি (Clairvoyance) ও দূরশ্রবণ (Clairaudience) প্রাপ্ত হইয়া দূরস্থ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষক দৃশ্য ও মহারথীগণের সিংহনাদ ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধহয় কথাটি তত অবিশ্বাসযোগ্য না-ও হইতে পারিত।' বলেছেন, 'যদি বলিতাম যে একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ অমুক লোককে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত (Hypnotised) করিয়া তাঁহার মুখে সেই দূর ঘটনার কতক বর্ণনা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা হইলেই যাঁহারা পাশ্চাত্য hypnotism-এর কথা মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেও পারিতেন।' এই আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দকে বলতে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে এমন অনেক শক্তি নিহিত রয়েছে যা আগেকার দিনে সভ্য জাতি জানতো এবং বিকাশে সচেষ্ট হতো। কিন্তু কলিযুগে অজ্ঞানের স্রোতে সেই বিদ্যা একেবারে ভেসে গেছে। কেবলমাত্র অল্প কিছু মানুষের মধ্যে গুপ্ত ও গোপনীয় জ্ঞানরূপে রক্ষিত রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, 'সূক্ষ্মদৃষ্টির চরম পরিণাম হলো দিব্যচক্ষু, যার প্রভাবে দূরের, গোপনের বা অন্যলোকের জ্ঞান ও বিষয় আমাদের গোচর হয়।' লিখেছেন, 'সূক্ষ্মদৃষ্টি বলিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মেন্দ্রিয় আছে যাহা দ্বারা আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাতীত পদার্থ ও জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারি, সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন, সূক্ষ্ম শব্দ শ্রবণ, সূক্ষ্ম গন্ধ আঘ্রাণ, সূক্ষ্ম পদার্থ স্পর্শ এবং সূক্ষ্ম আহার আস্বাদ করিতে পারি।' এই রকম আলোচনার পর শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস এইরকম দিব্যচক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন যা অবিশ্বাস করার কারণ নেই।'

দিব্যচক্ষু বিষয়ক এই আলোচনার শেষে শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধি— মহাভারত রূপক নয়, কৃষ্ণ ও অর্জুনও কবির কল্পনা নয়, গীতাও আধুনিক তার্কিকের সিদ্ধান্ত নয়। তাঁর উপদেশ, গীতার সব কথা যে অসম্ভব নয়, যুক্তিবিরুদ্ধ নয়, তা প্রমাণ করতে হবে। ▮

গীতাপাঠ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ : একটি অসত্যের অপনোদন

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি প্রচলিত মিথ, স্বামী বিবেকানন্দ গীতাগ্রন্থ ও গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলাকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'রিয়্যালিটি'-টি ঠিক কী! প্রস্তুত নিবন্ধে তারই বিস্তারিত আলোচনা।

স্বামীজীর একটি বাণী উদ্ধৃত করে অনেককে বলতে শোনা যায়, তিনি গীতাপাঠের বিরুদ্ধে ছিলেন। 'গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হবে'— হিন্দু বিরোধীরা এইটুকুই কেবল যত্রতত্র ব্যবহার করে থাকেন। অথচ এই বক্তব্যে স্বামীজী যে থেমে থাকেননি, সেকথা শুনছে কে! মহাপুরুষের বাণী খণ্ড খণ্ড করে ব্যবহার করা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটি রোগ। এবার জেনে নেবো স্বামীজী ঠিক কী বলতে চেয়েছেন।

মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী যখন উপরের মন্তব্যটি করছেন, তার সঙ্গে এটিও বলেছিলেন, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হলে তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভালো করে বুঝতে পারবে। যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলে অনুভব করবে, তখনই তোমরা উপনিষদ ও আত্মার মহিমা ভালো করে বুঝবে।

স্বামীজী কখনোই গীতাপাঠের বিরোধিতা করেননি। তাঁর নানান লেখায়, নানান বক্তব্যে, কথোপকথনে, চিঠিপত্রে অসংখ্যবার গীতা প্রসঙ্গের অবতারণা এসেছে। তাঁর গীতা অনুধ্যান যথেষ্ট সাহসী ও সদর্থক। তবে কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে, সম্ভবত এই অনুমান তিনি করেছিলেন। তাই সঙ্গে আরও বললেন, আমাকে খুব সাহসের সঙ্গে কথাগুলি বলতে হচ্ছে; কিন্তু না বললেই নয়। আমি তোমাদের ভালোবাসি। আমি জানি, সমস্যা কী —কাঁটা কোথায় বিঁধছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

এ প্রসঙ্গে আর যেটি বলার, লেকচারটির ভেতরে তিনি আরও দুই জায়গায় গীতার শ্লোক (৩/১৭) উদ্ধৃত করেছেন এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।

অর্থাৎ যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর আর কোনো কাজ বাকি থাকে না। পৃথিবীর সমস্ত দার্শনিক ভাবের পূর্ণতার এই ছবি। হিন্দুজাতির সমস্ত চিন্তা এবং মানব মুক্তির সামগ্রিক কল্পনার সারাংশ। আলোচনা করতে গিয়ে গীতার ওই শ্লোকটির আগে মুণ্ডকোপনিষদের ৩/১/১-৩ সংখ্যক শ্লোকের কথাও বললেন—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যন-শ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি।।'

সুন্দর পাখাওয়ালা বন্ধুভাবাপন্ন দুটো পাখি একই গাছের ওপর; একটি গাছের নীচু শাখায় কখনো মিষ্টি কখনো-বা তেতো ফল খাচ্ছে। আরেকটি রয়েছে ওপরের শাখায়, নিশ্চুপ-উদাসীন, নিজের মহিমায় মগ্ন হয়ে বসে। এই পাখি দুটিই জীবাত্মা এবং পরমাত্মা; যেন ইহজীবন ও পরজীবনের ছবি। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোকের সঙ্গে উপনিষদের মিল সেদিন বুঝিয়ে দিলেন স্বামীজী। সংসারের ব্যর্থ ভোগ এবং সুখ-দুঃখ থেকে বহু দূরে যখন মানুষ দিব্যদৃষ্টি লাভ করবে, তখন তাঁর পরমাত্মারূপ পাখিটি কোনো স্বাদু (সংসারে সুখ ও আনন্দ) অথবা তেতো (দুঃখ, বেদনা) ফল গ্রহণ করবে না, আপন মহিমায় আপনিই বিভোর হয়ে থাকবে। তারই সাদৃশ্যমূলক গীতার শ্লোক সেদিন বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো। সেদিন বক্তব্যের শেষে আবারও গীতা উদ্ধৃত করে স্বামীজী বললেন, কয়েকশো যুগ আগে ভগবান আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে এই মহান তত্ত্বগুলি শিখিয়েছেন। আমাদের উচিত তাঁর আদেশ কাজে পরিণত করা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ সংখ্যক শ্লোকটি পাঠ করলেন—

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।'

তাই স্বামীজী গীতা পড়তে বারণ করেছেন এবং একমাত্র ফুটবল খেলেই স্বর্গের নিকটবর্তী হতে বলেছেন, এটি একদম বাজে কথা। এরপর আলোচনা করবো আর কোথায় কীভাবে গীতার প্রসঙ্গ তিনি এনেছেন এবং গীতা মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করছেন।

১৯০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্র্যান্সিসকোতে 'কৃষ্ণ ও তাঁর শিক্ষা' বিষয়ে স্বামীজী বক্তৃতা দেন। কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করেন। বলেন সে যুগের মতো ঘটনা এ যুগেও ঘটতে দেখা যায়। তিনি বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের বিশাল হৃদয় সবচেয়ে প্রথমে সব মতের মধ্যে সত্যকে দেখতে পেয়েছিল। তাঁর শ্রীমুখ থেকেই প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর কথা বের হয়েছিল। মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে শেখানোই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আচার- অনুষ্ঠান, দেবার্চনা, পুরাণকথা সবই ঠিক, একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ক্রিয়াকলাপ, শাস্ত্র, প্রতীক সবই এক শৃঙ্খলের এক-একটা শিকলি। অকপটে লম্বা শিকলের মূল কেন্দ্র থেকে ছড়ানো একটা শিকলও যদি ধরতে পেরে থাকো, ছেড়ে দিও না, বাকি অংশটুকু তোমার কাছে আসতে বাধ্য। কোনো সোপান অন্যটা থেকে বড়ো নয়।

১৯০০ সালের ২৬, ২৮ ও ২৯ মে সান ফ্রান্সিসকোতে গীতা প্রসঙ্গে একাদিক্রমে তিনটি বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তৃতায় মন্তব্য করেন, গীতা বুঝতে গেলে তার ঐতিহাসিক পটভূমি বুঝতে হবে। কারণ গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ— খ্রিস্টান জগতে নিউ টেস্টামেন্টের মতো ভারতে এর স্থান (পৃ. ৫৯৪)। বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বিয়ে করেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ। সেগুলি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ নেই। তিনি যত মানুষের কথা জানেন, তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার, হৃদয়বত্তা— সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন মহান। কৃষ্ণের অনাসক্তি বিষয়ে বললেন তিনি, তাঁর কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন নেই, কোনো অভাবও নেই। কর্মের জন্যই তিনি কর্ম করেন। বিদেশি ভক্তমণ্ডলীর কাছে সেদিন বললেন, কর্মের জন্য কর্ম করো। পূজার জন্য পূজা করো। পরোপকার করো, কারণ পরোপকার মহৎ কাজ। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় বললেন, গীতার দৃশ্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের। পাঁচ হাজার বছর আগের। বিমর্ষ অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ থেকেই গীতার আরম্ভ। বললেন, আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলে ব্যাখ্যা করতে চাই। কিন্তু ভিখারির ত্যাগে কোনো কৃতিত্ব নেই। আমরা এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে যেন আচ্ছন্ন করে না ফেলি (পৃ. ৫৯৮)। তৃতীয় দিনের বক্তব্যে তিনি সমস্ত দুঃখের কারণরূপ ভয় দূর করার জন্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অনুসরণ করার কথা বললেন। যখন কেউ আর একজনকে দেখে, তার কথা শোনে এবং ভয়ে থাকে, যখন দ্বৈতবোধ আছে। যখন কেউ কাউকে দেখে না, দুঃখী কেউ নয়, অসুখীও কেউ নয়, একই আছেন, দ্বিতীয় কেউ নেই, সেটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

স্বামীজী গীতার মহাভারত-সমসাময়িকত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। 'ভাববার কথা' গ্রন্থে 'পারি প্রদর্শনী' শীর্ষক আলোচনায় আছে প্যারিসে গিয়ে তিনি একটি সভায় (১ আগস্ট, ১৯০০) গীতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণারাধনা বুদ্ধাপেক্ষা অতি প্রাচীন। গীতা যদি মহাভারতের সমসাময়িক না হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষাও প্রাচীন— নবীন কোনও মতে নহে। গীতার ভাষা মহাভারতের ভাষা এক।' বলেন, মহাভারতের মত এবং গীতার মত একই। কিন্তু কোনো বৌদ্ধোল্লেখ নেই। গীতায় যখন সমসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনা আছে, তখন বৌদ্ধদের উল্লেখ কেন নেই? যেখানে বুদ্ধদেবের পরবর্তী যাবতীয় গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করেও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হয় না, সেখানে গীতায় এই নীরবতা থেকে প্রমাণিত হয়, গীতার সময়কাল গৌতম বুদ্ধের আগে। স্বামীজী গীতাকে ধর্মসমন্বয়- গ্রন্থ বলেছেন। সেখানে কোনো মতের অনাদর নেই, সেখানে কাউকে উপেক্ষা নেই, নেই কাউকে ভয়েরও ভাব। ভগবান যেখানে বৈদিক হঠকারিতার উপর কঠিন ভাষা প্রয়োগে কুণ্ঠাহীন, সেখানে বৌদ্ধমতের প্রতি ভয় থাকার কথা নয়। সেই গ্রন্থে বৌদ্ধমত বঞ্চিত হলো কেন? কারণ বুদ্ধদেব পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন (পৃ. ৫৫)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধ-পূর্ববর্তিত্ব সম্পর্কে বলেন। বলেন, প্রত্নতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে প্রমাণিত হচ্ছে, ভারতের এই কিংবদন্তী সমস্তই সত্য। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা যেন বৃথা প্রবন্ধ-কল্পনা না করে এই কিংবদন্তীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন (পৃ. ৫৪)। স্বামীজীর এই বক্তৃতার সারাংশ ফরাসি ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল।

কলকাতায় যখন স্বামীজী আলমবাজার মঠে ছিলেন, তখন তাঁর কাছে কয়েকজন যুবক সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হলেন। স্বামীজী তাদের নানান বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে 'গীতাতত্ত্ব'-ও ছিল। সেই আলোচনায় স্বামীজী মত প্রকাশ করলেন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমগ্র মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করার আগে গীতা সর্বসাধারণের মধ্যে তত পরিচিত ছিল না। মহাভারতের কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে বিহার করছেন, আর ভাগবতে রয়েছে কৃষ্ণের রাসলীলার কথা। অতি প্রাচীনকালে এ দেশে 'মদনোৎসব' নামে একটি উৎসব প্রচলিত ছিল। সেটাকেই লোকে দোল রূপে পরিণত করে কৃষ্ণের উপর চাপিয়েছে, এমনটাই সন্দেহ করেছেন তিনি। কালের প্রবাহে রাসলীলাও ওইভাবে চাপানো হতে পারে, এমনটাই তাঁর মত। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাজারাই তো ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। গীতাকার মহাপুরুষ হিন্দু সমাজে নতুনভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ছিল, সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম।

মাদ্রাজে 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বললেন, গীতা না পড়লে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বোঝা যাবে না; কারণ গীতার প্রচারক তাঁর নিজের উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন, ভগবদগীতার সাকার বিগ্রহ ছিলেন। অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। অনেককে রাজা করলেন, নিজে রাজা হলেন না। স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত ভারতের নেতা বলেছেন, যাঁর কথায় রাজারা নিজেদের সিংহাসন ছেড়ে দেয়, অথচ তিনি রাজা হতে চান না। স্বামীজী কৃষ্ণজীবনের ছোটোখাটো খুঁটিনাটি নিয়ে সময় নষ্ট না করে, তাঁর জীবনে আসল অংশ গ্রহণ করতে বলেছেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিতে অনেক ঐতিহাসিক অমিল আছে, হয়তো অনেক বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম

ফঃ ৪

প্রেমতত্ত্ব জগতে অভিনব (পৃ. ৭৩৮)।

উপনিষদের সঙ্গে গীতার পার্থক্যটি এবং বিশেষত্বটি ঠিক কোথায় তা আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু ভক্তি সম্পর্কে কোনো কথা নেই বললেই চলে। গীতায় ভক্তির কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। গীতার মধ্যে সকল শাশ্বত সত্য ফুলের মালা বা তোড়ার মতো সাজানো। উপনিষদ যেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে কাঁটা-পাতা-শিকড় সুদ্ধ এক অপূর্ব সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ; সবকিছুর মধ্যে খুঁজে বেছে বার করে নিতে হবে তাকে। উপনিষদে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার হঠাৎ এক একটি মহাসত্যের অবতারণা করা হয়েছে। গীতার মধ্যে সবকিছুই সাজানো। (পৃ. ৭৬৬)

গীতার নতুনত্ব নিয়ে স্বামীজীর আরও মতামত পাওয়া যায়। সমন্বয় ভাব এবং নিষ্কাম কর্ম গীতার বিশেষত্ব। আগের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের থেকে গীতার নতুনত্ব তার সামঞ্জস্যের প্রচেষ্টার মধ্যে। আগে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সবগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ লক্ষ্য করা যেত। গীতাকার এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা করলেন। গীতাকার সমকালীন সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়ে যাওয়া উত্তমকেই গ্রহণ করলেন। তদুপরি গীতার নিষ্কাম কর্মের কথাও আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নিষ্কাম কর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিলে চলবে না। নিষ্কাম হওয়া মানে উদ্দেশ্যহীন হওয়া নয়। স্বামীজী বলছেন, যদি অর্থ এমনটাই হতো, তবে হৃদয়শূন্য পশুরা এবং দেওয়ালগুলোকেও নিষ্কাম কর্মী বলা যেত। নিষ্কাম কর্মী পশুর মতো হৃদয়শূন্য, জড় প্রকৃতির হতে পারেন না। অন্তর ভালোবাসায় এবং সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হবে নিষ্কাম কর্মীর; সমগ্র জগৎকে প্রেমের সঙ্গে আলিঙ্গনই তাঁর স্বভাব। এরকম প্রেম ও সহানুভূতি বোঝার লোক বিরল।

'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে' কথাটি স্বামীজী প্রায়ই বলতেন তাঁর পার্ষদ-পরিকর-শিষ্যদের মধ্যে মহাশক্তি জাগরণের জন্য। নিজে সচেতনভাবে তা উল্লেখও করেছেন। কথাটির অর্থ হলো, তোমাতে এ সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি স্বরূপ ভুলে নিজেকে পাপী রোগী শোকগ্রস্ত করে তুলেছ— এ তোমার পক্ষে সাজে না। তিনি 'ভয়'-কে 'পাপ' বলছেন, আর যে কাজে শক্তির উদ্রেক ঘটে তাই 'পুণ্য'। তাই দুর্বলতা পরিত্যাগ করতে হবে। গীতার যে শ্লোকটিতে এই কথাটি আছে, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক—

'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।'

অর্জুন (পার্থ)-কে সম্মান হানিকর ক্লীবত্বের বশবর্তী হতে বারণ করছেন শ্রীকৃষ্ণ। তার পক্ষে এই ধরনের আচরণ অনুচিত। হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে তাকে উঠে দাঁড়াতে উপদেশ দিচ্ছেন। স্বামীজী বলছেন, প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হয়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয়নি। তমোগুণ থেকেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হয়েছিল।

অহিংসা পরম ধর্ম— এই অজুহাতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কাপুরুষ ও কপট বললেন (পৃ. ১১২)। স্নেহ-ভালোবাসা বশত দেশের ও রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলে গেছিলেন তিনি। 'পণ্ডিতের মতো কথা বলিতেছ অথচ কাপুরুষের মতো কাজ করিতেছ; ওঠ, দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।' স্বামীজী 'কর্মযোগ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ সংখ্যক শ্লোকের সহায়তা নিলেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।

স্বামীজীর মতে এটাই কর্মযোগের প্রধান ভাব, শক্তির উচ্চতম বিকাশ। কাজ করতে গেলে সংগ্রাম করতে হবে, যতদূর সাধ্য নতুন উদ্যমে আঘাত করতে হবে। প্রতিকার শক্তি যার আয়ত্তে আছে, একমাত্র তার পক্ষেই অপ্রতিকার ধর্ম বিবেচ্য।

সত্ত্বগুণীদের স্বভাব এমনই যে, তাঁরা অন্য মুহূর্তে যেমন শান্ত, বিপদেও তেমনই ধীর। স্বামীজী বলছেন, অর্জুনের মধ্যে যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি ছিল না তা নয়, কারণ তিনি যুদ্ধ করতেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। পরে বিপক্ষে প্রচুর সৈন্যব্যূহ সাজানো দেখে তাঁর চিত্তবৈকল্য ঘটে। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিছুটা একরকম দেখালেও তাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। এই তমোগুণ সত্ত্বগুণের পোশাক পরেও আসতে পারে। অর্জুনের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল, দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হয়েছিল।

ভগবান নিজেও কর্মবিচ্যুত নন। তিনি অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন। 'কর্মযোগ' গ্রন্থে 'কর্মরহস্য' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২২-২৪ সংখ্যক শ্লোকের অবতারণা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'হে অর্জুন আমাকেই দেখ না, আমি যদি এক মুহূর্ত কর্ম থেকে বিরত হই, সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। কর্ম করে আমার কোনো লাভ নেই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম করি কেন? জগৎকে ভালোবাসি বলে (পৃ. ১২০)।'

স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের মহাশক্তির আধাররূপে বিবেচনা করে দেশের বাতাসে ভয়ের কম্পন উলটিয়ে দিতে বলেছেন। 'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ' কথাটি জগতকেও শোনাতে বলেছেন। বলেছেন সর্বশক্তিমান হতে, ভয় না করে তোপের মুখে এগিয়ে যেতে। সেজন্যই দেখি পরাধীন ভারতবর্ষে বিপ্লবীরা স্বামীজীর উপদেশ, বাণী ও ছবি সঙ্গে রাখতেন। স্বামীজীর মতে এই একটি মাত্র শ্লোকের মধ্যে গীতার সমগ্র ভাব নিহিত আছে (পৃ. ৭৬৬)।

স্বামীজীর অজস্র লেখা, বক্তৃতা, চিঠিপত্র, কথোপকথনের মধ্যে তাঁর গীতা গ্রন্থের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পরতে পরতে দেখতে পাওয়া যায়। বিস্তারিত তালিকা নিয়ে আলোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব। স্বামীজীর গীতা অনুধ্যান সামগ্রিকভাবে বোধগম্য হলে, তবেই যথার্থ বিচার করতে সক্ষম হবো। পরিযেশে বলা যায়, প্রসঙ্গের প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্যায় ও অশোভন। 'সম্পাদিত' বিবেকানন্দ রচনাবলী না পড়ে, আমরা যদি মূল ও অমোচ্য বিবেক- সাহিত্যের আদি সংস্করণগুলি পড়ি, তবেই সঠিক বিচার হবে। এজন্যই পুরনো গ্রন্থাগারগুলিতে যাওয়া দরকার। আকর গ্রন্থের আদিপাঠ করা দরকার।

তথ্যসূত্র :

বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, অখণ্ড বাংলা সংস্করণ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২১তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অনুধ্যান
পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতা

ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ‘অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং’। অদ্বৈত অমৃত বর্ষণকারী সর্বযুগের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ জীবন-গ্রন্থ। সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সাতশো শ্লোকের অনবদ্য শৃঙ্খলায় গ্রন্থিত হয়েছে ‘ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্’— স্বয়ং ভাগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীরূপে। উদ্দেশ্য ছিল, ‘পার্থায় প্রতিবোধিতাং’— আমাদেরই প্রতিনিধি পার্থ অর্থাৎ বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে প্রতিবোধিত করা, তাঁর মোহনাশ করা। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যখন কৌরব-পাণ্ডব মুখোমুখি, যেন দাঁড়িয়ে আছে প্রেয়-শ্রেয় একে অপরের সম্মুখে, হঠাৎই এমন সংকট মুহূর্তে অর্জুনের মনে বিষাদ ঘনিয়ে এল। এক নিদারুণ ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ তিনি। এর পূর্বে সাম-দান-দণ্ড-ভেদ নীতি ব্যর্থ হয়েছে, স্বয়ং দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে যিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কূটনীতিক, রাজা, প্রাজ্ঞ ও যোদ্ধা (তাঁর ঈশ্বরত্ব/ অবতারত্ব বাদই দিলাম)।

দীর্ঘ তেরো বছরের বনবাস- অজ্ঞাতবাসের গ্লানি আত্তীকরণ করে অধর্মের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন পাণ্ডবপক্ষ এবং নিরস্ত্র বাসুদেব স্বয়ং পার্থসারথিরূপে, হঠাৎই যেন ছন্দপতন। যুদ্ধক্ষেত্রে যে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনকে দেখে স্বয়ং দেবতারাও ভয়ে সন্ত্রস্ত হতেন সেই পার্থর মনে আত্মীয়, গুরু, পরিজনকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখে মোহ উপস্থিত হলো। ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায় ভুলে গিয়ে এক প্রবল প্রতাপশালী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল, সারা শরীর ঘামতে শুরু করল, মুখ শুকিয়ে গেল, ত্বক দগ্ধ হতে লাগল— ‘সীদন্তি মম গাত্রানি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।। গাণ্ডীবং সংস্রতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে। ন চ শক্নোমবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।।’ (গীতা, ১/২৯-৩০)। অর্জুন পরে স্বীকার করেছেন, তিনি ‘কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ’ অর্থাৎ বুদ্ধির কৃপণতা বা মলিনতাদোষে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সখা কৃষ্ণকে বলছেন, ‘শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্’, আমাকে শাসন করো, হে কৃষ্ণ! আমি তোমার প্রপন্ন, শরণাগত। এরপর বলেছেন আসল কথা, আমি ‘ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ’ আমি বিভ্রান্ত। আমাকে যা শ্রেয় (প্রেয় নয়!) সেটি নিশ্চিত করে বল।

কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষ--- দুই সৈন্যদলের ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলছেন তিনি স্বধর্ম বিষয়ে বিমূঢ়। শরীর কম্পমান, চিত্ত অবসন্ন, এই যুদ্ধের ফলে শুধুই লোক মারা যাবে, আরও বড়ো কথা, মৃতদের মধ্যে থাকবে তাঁর নিকট আত্মীয়-পরিজন, সুতরাং তিনি যুদ্ধ করবেন না। অস্ত্র নামিয়ে রাখলেন, রথে বসে পড়লেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছেন, এই সংকট মুহূর্তে এরকম বিষম মোহ তোমার মধ্যে কোথা থেকে উপস্থিত হলো--- ‘কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্’ (গীতা, ২/২)। ‘হে পার্থ! ক্লীবতা তোমাকে শোভা পায় না। কাপুরুষতা ত্যাগ কর। হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও ‘ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ’ (গীতা, ২/৩)।

শ্রীভগবানের এই আহ্বান শুধু অর্জুনের প্রতি ছিল কি? ‘ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ’ কি শুধু পার্থই হয়েছিলেন? শ্রেয়-প্রেয়র

দ্বন্দ্বে কি শুধু কৃষ্ণসখাই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন! পার্থসারথির এ বজ্রনির্ঘোষ কি আমাদের জন্যও নয়? ধর্মযুদ্ধে কি আমরাও সৈনিক নয়? সে ধর্ম যেমন অন্তরে শুদ্ধতার লক্ষ্যে, তেমনই-সমাজ-দেশ-জাতির জীবনরক্ষার্থেও নয় কি! নাহলে পাঁচ হাজার বছর অতিক্রম করেও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শঙ্খনাদ ধ্বনিত হবে কেন বারবার ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের দরবারে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে? অধ্যাত্মশাস্ত্র হয়েও কেন গীতার প্রাসঙ্গিকতা বছরের পর বছর উৎসারিত হবে সুন্দর সমাজ তথা আদর্শ দেশ নির্মাণের প্রয়োজনে! এই ধর্মগ্রন্থ বা অধ্যাত্ম গ্রন্থ কেন শুধুই দুই সখার কথোপকথন মাত্র নয়, এক অভিনব গুরু-শিষ্য সংবাদ। ধর্মযুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রেয় কী, আর প্রেয় কী, ধর্ম কী আর অধর্ম কী, এই বিষয় নিয়ে গভীর দ্যোতনাময় এক অবিসংবাদী গ্রন্থ গীতা এবং একটিমাত্র গ্রন্থ যার আজও পর্যন্ত জন্মদিন পালন হয় যা বিশ্বের ইতিহাসে এক ও অদ্বিতীয় ঘটনা! সনাতন ধর্ম কী ও কেন, সেটি কেউ যদি শুধুমাত্র গীতাগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন বুঝতে পারবেন অনায়াসে। সানন্দে স্বীকার করবেন গীতোক্ত কর্মী, গীতোক্ত যোগী হতে পারলে ব্যক্তিগত চরিত্র ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র-দুইই নির্মাণ হবে এবং ভারতবর্ষ গীতার আধারেই একমাত্র নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের দুই স্তম্ভের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

এক বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার প্রতিচ্ছবি শ্রীকৃষ্ণ তুলে ধরেছেন গীতাশাস্ত্রে; কর্মের এক নতুন সংজ্ঞা উপস্থাপনা করেছেন। যে কর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানের বিপ্লবী থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী, গৃহস্থ থেকে সন্ন্যাসী ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দেশমাতৃকার চরণে— সে পরাধীনতার সময়ে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যেই হোক বা সে দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করে দেশহিতে, ধর্ম রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করে দেওয়াতেই হোক। শুধু 'আত্মনো মোক্ষার্থং' নিজের মুক্তি নয়, 'জগদ্ধিতায়' বিশ্বের কল্যাণের প্রয়োজনে ভারতবর্ষকে অর্জুনের মাধ্যমে নিমিত্ত করে স্বয়ং ভগবানের শ্রীকণ্ঠে গীতা প্রতিধ্বনিত হয়েছে, 'যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা'। দেশমাতার বীর সন্তান শ্রীঅরবিন্দ যখন কারাগারে অবস্থান করছেন ১৯০৮-০৯ সালে, দর্শন পান বাসুদেব কৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দের হাতে গীতা দেন। শ্রীঅরবিন্দের ১৯০৯ সালে প্রদত্ত বিখ্যাত 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' (Uttarpara speech)-এ তিনি বলেছেন, '...তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। ...যারা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি চান — রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না করে তাঁর জন্য কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চ নীচ, শত্রু-মিত্র, জয়-পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে। অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না। আমি অনুভব করলাম হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম কী। আমরা অনেক সময়েই হিন্দুর ধর্মের কথা, সনাতন ধর্মের কথা বলি, কী সে ধর্ম কী বস্তু তা আমাদের মধ্যে কজন জানেন? ...সনাতন ধর্ম হচ্ছে জীবনই। এটি এমন জিনিস যা শুধুই বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলবার। ...এই ধর্ম দেবার জন্যই ভারত উঠছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় সে নিজের জন্যে উঠছে না অথবা যখন সে শক্তিমান হবে তখন দুর্বল পদদলিত করবার জন্যও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে, জগৎ মাঝে সেই জ্যোতি বিকিরণ করবার জন্য সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্যে জীবনযাপন করেছে, নিজের জন্যে নয়, আর তাকে যে বড়ো হতে তাও তার নিজের জন্য নয়, মানবজাতির জন্যে।' (অনুবাদ : অনিলবরণ রায়, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির)।

সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ ও গীতার কর্মযোগ বা শিক্ষার বিষয়ে এর চেয়ে সুন্দর, উপযোগী কথা আর কী হতে পারে! গীতোক্ত কর্মী হবেন অহংকর্তৃত্বাভিমানরহিত, ফলাভিসন্ধিরহিত, সর্বকর্মফল সমর্পিত এক বিবেকবান ব্যক্তি। এই রকম পূর্ণাঙ্গ স্বার্থরহিত মানুষেরই আজ বড়ো প্রয়োজন। সমাজে সেরকম মানুষ একমাত্র গীতার অনুধ্যানের ফলেই প্রস্তুত হতে পারেন! কে ভক্ত? কে ভগবানের সবচেয়ে প্রিয়? শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম গ্রন্থ বললেন না লক্ষ লক্ষ জপের কথা, কীর্তনের কথা। বললেন না আরাধনা-তপস্যার বিশেষ কোনো আঙ্গিকের কথা। 'তে প্রপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ' (গীতা ১২/৪)— যিনি সর্বভূতের কল্যাণে রত আছেন, তিনিই আমাকে (ভগবানকে) প্রাপ্ত হন। অন্যত্র বলেছেন, শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' (গীতা, ১২/১৩)— যিনি ভক্ত সর্বভূতের প্রতি তিনি দ্বেষরহিত হবেন, সকলের জন্য মিত্রতা রাখবেন, করুণামূর্তি হবেন। এই তো সনাতন ধর্ম তথা ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট শিক্ষা। ধ্যানযোগে শ্রীভগবান বলছেন, সাধনার চরম অবস্থায় উপনীত হলে কী লাভ হবে? 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন/সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ' (গীতা, ৬/৩২)। ভগবান বলছেন এক আশ্চর্য কথা— হে অর্জুন! যিনি সকলের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে মনে করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এই আকাশপ্রতীম উদারতাই সনাতন ধর্ম তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা যা যুগে যুগান্তরে পথ দেখাবে বিশ্বকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থ তাই জীবনে পথচলার আলোকবর্তিকা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমাদের জীবনরথের সারথি। আমরা যখন জীবনযুদ্ধে অর্জুনের মতো বিভ্রান্ত হব, কখনো কখনো মোহ গ্রাস করবে আমাদের, শ্রেয়-প্রেয় অভিঘাতে ধর্মযুদ্ধে— সংসার সংগ্রামে যোদ্ধার বেশে দাঁড়িয়ে কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করতে পারব না, তখন স্মরণ করব গীতার বজ্রনির্ঘোষ 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন'— হে সব্যসাচী! নিমিত্তমাত্র হয়ে সকল কর্তব্যকর্ম কর। অহংশূন্য হও, ফলের প্রত্যাশী হইয়ো না 'তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর'— ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে আসক্তিরহিত হয়ে কর্মের অনুষ্ঠান কর। ভয় নেই! আমি আসব! আমি বারবার আসি 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত' তখন সাধুব্যক্তির পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীর বিনাশ ও 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' আমি অবতীর্ণ হই (গীতা, ৪/৭-৮)।

সেই কারণে শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাণী যদি কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করেন, তিনি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবেন। আর যদি কোনো জাতি বা দেশ গ্রহণ করে, সেই জাতি সেই দেশ সনাতন হিন্দুধর্মের এই আদর্শে ধন্য হবে, পুণ্য হবে। সমগ্র বিশ্বের কাছে তাই আজ গীতার বাণীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব।

(লেখক অধ্যাপিকা, পদার্থবিদ্যা আরসিসিআইআইটি, কলকাতা)

নবান্ন উৎসব ও বাঙ্গলার কৃষিকৃষ্টি

কল্যাণ গৌতম

নতুন শালিধান, নতুন অন্নকে কেন্দ্র করে গ্রামবাঙ্গলার যে সর্বজনীন উৎসব, তাই নবান্ন। ধরণীর উপহারে 'ঋতুর খাঞ্চা' তখন ভরে ওঠে, নবীন ধানের আঘ্রাণে মাত হয় অঘ্রাণ; মাঠে মাঠে আমন ধান পেকে ওঠার সোনালি শোভা। 'গোবিন্দভোগ' চালের পায়েস-পরমান্নের সুবাসে আর 'গিন্নি পাগল' চালের ফিরনির ভুরভুরে গন্ধে; বিশ্বাস-সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত চিন্তন-পরিমণ্ডলে এ এক অনবদ্য অনুষ্ঠান; আর তাতে পুরোটাই 'মাটির গন্ধ'। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'নবান্ন' আর কাজী নজরুলের 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় তার অনবদ্য আঘ্রাণ। নতুন ধান মুখে তোলার আগে ইষ্টদেবতার কাছে উৎসর্গ করা হবে। নবীন ধানের ছড়ায় নানান অলংকার বানিয়ে কৃষক তার বাড়ি দরজা অলংকরণ করবে। কৃষক বাড়ির উঠোন, মরাই তার জীর্ণতা দূরে সরিয়ে-সারিয়ে হয়ে উঠবে নান্দনিক। ধান্যলক্ষ্মী ঘরে আসছে ডালাভরা পাকা ফসল নিয়ে। 'লেপিয়া আঙিনা দেয় আলপনা ভরা মরাইয়ের পাশে,/লক্ষ্মী বোধহয় বাণিজ্য ত্যজি এবার নিবসে চাষে।'

অঘ্রাণ মাস নতুন ফসলের বার্তা বয়ে আনে, নতুন আশা; নতুন করে জীবনের জয়গান গেয়ে ওঠেন পল্লীকবি। তখন কৃষকের গোলায় ধান আর গলায় গান— 'প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে নয়া হেউতি ধান।/কেউ কাটে কেউ ঝাড়ে কেহ করে নবান।।' আনন্দ এ কারণে— 'নবান্ন' মানে খাদ্যের নিরাপত্তা। অন্নের ভাণ্ডার তখন পূর্ণ; দু'মুঠো অন্ন-সংস্থানের পরও জলপানের আনন্দ। নিরন্নের অন্নস্বপ্নের তখন যথার্থ লগ্ন। ক্ষুধার্তের কাছে তখন অন্নই দেবী লক্ষ্মীরূপে, অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা রূপে প্রকৃত আরাধ্যা, দয়াময়ী মাতৃরূপা। বাঙ্গলার প্রাণলীলার সকল ভিত্তি এই অঘ্রাণ, এই নবান্ন— 'ওরে অগগেরান মাসেতে দ্যাশে জরমে নতুন ধান/ওরে চিড়ামুড়ি দিয়া লোকে করেনও জলপান।' কিন্তু এমন আনন্দঘন দিবসেও বিরহী রাধার কুঞ্জে কৃষ্ণ যে আর আসবেন না। লোককবি তাই আনন্দের মাঝেও বিরহিণী রাধার দুঃখের বারোমাস্যার কথা বিস্মৃত হন না— 'অঘ্রায়ণে নবান্ন হয় ঘরে ঘরে/আমার কুঞ্জে নাই যে কৃষ্ণ অন্ন দিব কারে?'

নবান্ন উৎসব আসলে ধান্যলক্ষ্মীর

আরাধনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'গণদেবতা' উপন্যাসে লিখছেন, '...কার্তিক সংক্রান্তির দিনে কল্যাণ করিয়া আড়াই মুঠা কাটিয়া আনিয়া লক্ষ্মীপূজা হইয়া গিয়াছে, এইবার লঘু ধানের চাল হইতে নানা উপকরণ তৈয়ারি করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের ভোগ দেওয়া হইবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে হইবে ধান্যলক্ষ্মীর পূজা।' ধান্যলক্ষ্মী বলেই তাঁর ধানের খোসার মতো গায়ের রং হলদে। লক্ষ্মীর মতো পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্গলার টুসু মূর্তির রং হলদে, মাথায় মুকুট, দুই হাতে দুটি পদ্ম, সারা অঙ্গে নানা রকম গহনা। কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'কমলামঙ্গল' কাব্যে দেবী লক্ষ্মীর আবরণ ও আভরণ হচ্ছে অজস্র রকমের ধান। কোনোটি দেবীর পায়ের আলতা, কোনোটি পাসুলি, কোনোটি আবার গলার সাতনরী হার। দেবীর চুলের অলংকার, সিঁথি থেকে পায়ের নুপূর সর্বত্রই ধানের অপরূপ ব্যবহার।

'পদাঙ্গে লক্ষ্মীর অঙ্গে আলতা পরিধানে।
কিরণ দেখিতে যেন আলতা সমানে।।
তবে তো কণকচূড় পরিলেন পাসুলি।
নূপুর গরুড়ধান্য সীতাভোগগুলি।।
বাঁকমল পাতামল কামিনী উজ্জ্বলে।
কিঙ্কিণী জামাইনাড়ু আর পদ্মদলে।।
খইহার ধান্যের মালা পরিল গলায়।
দেসুতি শীতলজিরে হরিভোগ তায়।।
পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার।
উরুর উপরে পরেন বড়ো শোভা তার।।
সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।
নয়ানে অঞ্জন লক্ষ্মীকাজল করিল।।
মুক্তাশাল সিঁথায় সিঁন্দুর শোভা পায়।
করবী আঁটিল ধান্য কামিনীজটায়।।
লক্ষ্মীভোগ পুণ্যভোগ খোঁপায় রাখিল।
মুক্তঝুরি পাটখোপ পিঠেতে দুলিল।।'

'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, মেক্সিকোয় ফসল ঘরে তোলার মুখে ভুট্টার ছড় দিয়ে তারা গড়ে 'ছড়া-মা' মূর্তি। কীভাবে জগৎ পারাপার করে বাঙ্গালিও তাদের ধানের দেবীকে ধান্য-অলংকারেই সজ্জিত করেন। লক্ষ্মী-সাধনার এ এক বিশ্বরূপ।

বরিশালের একটি ছড়ায় পাই, 'কো কো কো, আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন/শুভ নবান্ন খাবা/কাক বলি লবা/পাতি কাউয়া লাহি খায়, /দাঁড় কাউয়া কলা খায়,/কো কো কো, মোরগো বাড়ি শুভ নবান্ন।' নবান্নের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে গ্রামবাঙ্গলার যৌথ-সংস্কৃতির হারানো-যোগসূত্র। নবান্নের সুস্বাদ পঞ্চভূতে উৎসর্গিত হয়, নিবেদিত হয় আদি পুরুষ, সত্যযুগের মুনি-ঋষি এবং পূর্বপুরুষদের। পরিবেশিত হয় গৃহের অতিথি নরনারায়ণকে। খাওয়ানো হয় গাই-বলদ, প্রকৃতির নানান জীবজন্তু, ঝোপের শেয়াল, গাছের পাখি, পুকুরের মাছ, গর্তের ইঁদুর, পিঁপড়ে, পোকামাকড়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের দেবতা, বাস্তুতন্ত্রের জীবকুলকে খাইয়ে গৃহের আবাসিকেরা নবান্নের স্বাদ পান। আদতে দেবতা-পূর্বপুরুষের ভাগ ভাগাভাগি করে তো বন্যেরাই পায়। এ যেন ধান্য-সম্পদ রূপে পৃথিবীর ক্ষুধা-নিবৃত্তি। স্বর্ণাবরণ তুষের অভ্যন্তরে শস্যের শ্বেত-শান্তির মহান পূজা। গ্রামবাঙ্গলা নবান্ন কেন একেলা ভোগ করে না, কেনই-বা থরে থরে সাজিয়ে তা প্রকৃতি মাতাকে উৎসর্গ করে, তার অধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 'নবান্ন' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, '...যেখানে উৎসর্গ নাই, দেবতার উদ্দেশে নিবেদন নাই, সেখানে অনিবার্য অতৃপ্তি, জ্বালাময়, ভোগ-লালসা। নবান্নের অন্ন আমরা একা গ্রহণ করি না। আত্মীয়-স্বজনকে দিই, পাড়া-প্রতিবাসীকে বিলাই, গ্রামের সকলকে সাধিয়া বিতরণ করি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলকে অর্পণ করি। কেন? না করিলে আমি পশু হইয়া যাইব। ...আমার যে ক্ষুধা, তাহা যে বিশ্বেরও ক্ষুধা।'

রাঢ়বঙ্গের কোনো কোনো স্থানে যেমন কাটোয়া মহকুমার নবান্ন উৎসবে কার্তিক পূজা হয়। এই কার্তিক 'নবান্নে কার্তিক'। আসলে কার্তিকও কৃষিদেবতা। কৃষি-অরণ্য- পরিবেশের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে মা-দুর্গা ও তাঁর সন্তানদের। পরিচিতির আড়ালেও রয়েছে তাঁদের অন্যতম পরিচয়। সৌরদেবতা কার্তিক যুক্ত হয়েছেন উর্বরতার সঙ্গে। কার্তিক-ঊষার পুরাণ-কাহিনিও তাকে মান্যতা দিয়েছে। ঊষার শস্যক্ষেত্রে চির-অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কাহিনিতে রয়েছে সৌরশক্তি শস্যক্ষেত্রের উদ্ভিদদেহে ক্লোরোফিল সমৃদ্ধ সবুজ কলায় শোষিত হবার ইঙ্গিত।

কার্তিক যে উর্বরময়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার অন্য একটি প্রমাণ হচ্ছে, এই পূজায় ব্যবহার হয় 'অ্যাডোনিস গার্ডেন'-এর অনুরূপে চারাগাছপূর্ণ সরা। তাতে কার্তিকের প্রতীকরূপে পূজিত হয় গঙ্গামাটিতে অঙ্কুরিত ধান, ছোলা, মটর, কচু ও শুশনিশাক। উত্তরবঙ্গে কার্তিক সংক্রান্তিতে সারারাত ধরে যে গান ব্রতিনীরা পরিবেশন করেন তার বিষয় হলো ফসলের কীটশত্রু, জীবজন্তু তাড়িয়ে দেবার কাহিনি। তাই মনে করা যেতে পারে, শস্য-রক্ষাকর্তা দেবতাকে তুষ্ট করে শস্য ঘরে তোলার জন্যই কাটোয়াতে 'নবানে কার্তিক' পূজিত হন।

কোথাও কোথাও নবান্ন উৎসব 'চাল লবান' আর 'ভাত লবান'— এই দু'ভাবে পালিত হয়। চাল-লবানে এক আশ্চর্য খাদ্য প্রস্তুতি চলে আগের দিন রাত থেকে। নতুন আতপ চাল ভিজিয়ে পরদিন তা ঢেঁকিতে আধকুটো করে তাতে মেশানো হয় খেঁজুরগুড়, দুধ, খোয়াক্ষীর, মণ্ডা, নানান ফলের টুকরো আর আদার কুচি। অপূর্ব সুস্বাদু এই খাবারের নাম 'চাল-লবান' বা চাল-নবান্ন। ভাত-লবানে নতুন চালের ভাত তৈরির গল্প। পুরনো চালে নতুন চাল মিশিয়ে ভাত রাঁধা হয়। আর চাষির মেয়ে রাঁধতে রাঁধতে ছড়া কাটে, 'লয় পুরোনো শাড়ি চারি,/লয় পুরোনোয় বাকার বাঁদি,/নতুন রাদি পুরোনো খাই,/এই করে যেন জীবন যায়। লতুন বস্ত্র পুরোনো অন্ন,/এই যেন পাই জন্ম জন্ম।'

নবান্ন গ্রামবাঙ্গলাকে মুখরিত করে তোলে। সকালে শিশু-বালক-বালিকার নানান লোকক্রীড়া; প্রবীণদের চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা; সন্ধ্যায় কবিগান, ভাসান গান তাকে মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। আর তার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় 'বাসি নবান'; তাতে আমিষের ঢালাও আয়োজন। □

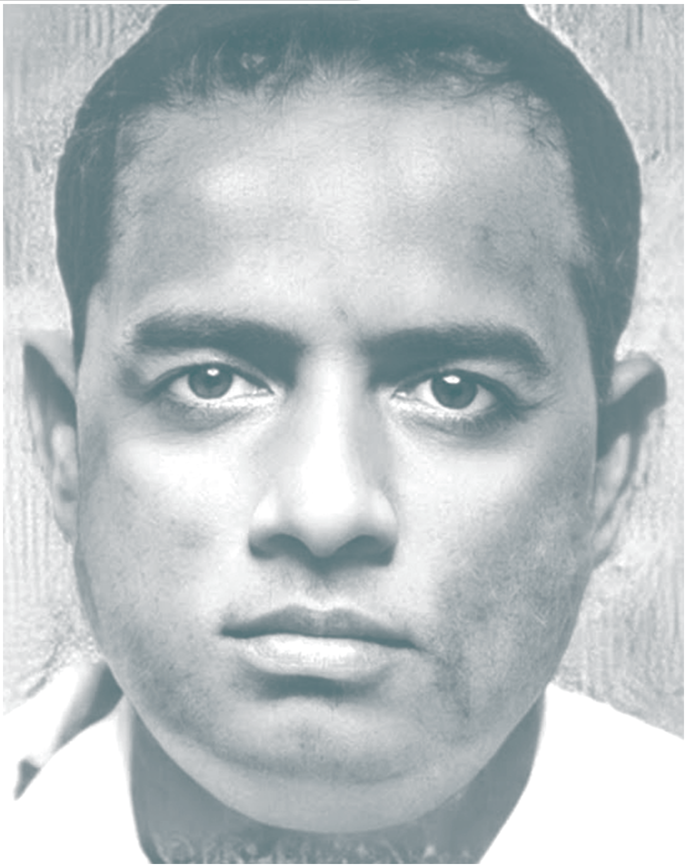

হুগলী জেলার বরেণ্য সন্তান

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বিনয় মণ্ডল

হুগলী জেলার কাছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ঋণের শেষ নেই। বাংলা হরফ, মুদ্রাযন্ত্র, মুদ্রিত পুস্তক, বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি-বাংলা অভিধান, সংবাদপত্র, বরফ কল, সাময়িক পত্র, কাগজের কল, চটকল, রেলওয়ে প্রভৃতির আবির্ভাব ভারতবর্ষের মধ্যে হুগলী জেলাতেই প্রথম। সমাজ সংস্কার ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে হুগলী যেন বীরভোগ্যা। হুগলী জেলায় এক মনীষী যাঁর জন্ম খন্যান গ্রামে। যে খন্যান এই গর্বিত হুগলী জেলার এক অংশ। আর এই গ্রাম সেই মহান ব্যক্তিত্বের আলোকোজ্জ্বল কর্মধারায় গর্বিত। যে মহাপুরুষের কথা স্মরণ করার প্রচেষ্টা করব তিনি— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে ব্রহ্মবন্ধু—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়— উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। জন্ম ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১। অর্থাৎ যে সময়কালে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ড. নীলরতন সরকার, অক্ষয় কুমার মৈত্র প্রমুখ ও ব্যক্তিত্ব।

ধান ভানতে শিবের গাজনের মতো একটু আলোকপাত করি খন্যান গ্রামের অতীতকালটা। বাঙ্গলার অতীতকাল সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, পরে সমুদ্র দক্ষিণাভিমুখী হওয়ায় এই ভূমিখণ্ড সাগর থেকে উন্নীত হয় এবং ক্রমশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটিতে পুষ্ট হয়ে আধুনিক বাঙ্গলার কিয়দংশের পত্তন হয়েছে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ মিস্টার ভ্যালেন্টাইন বল হুগলি জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামের এগারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কুনকুনে নামক গ্রামে প্রত্ন প্রস্তর যুগের একটি হরিতাভ প্রস্তর নির্মিত কুঠারফলক আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে রাঢ়বঙ্গের হুগলী জেলায় আদিমকালে যে মানুষের বসবাস ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ মিস্টার জে কগিন ব্রাউন অনুমান করেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ১৫ লক্ষ বছর আগে বাঙ্গলার প্রত্ন-প্রস্তর যুগ ছিল। বঙ্গ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ সর্বপ্রথম ঋকবেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২/১/৩) দেখতে পাওয় যায়।

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যয়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি।

বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যান্যা অর্কমভিত বিবিশ্র ইতি।।

অর্থাৎ বঙ্গদেশ, মগধ ও চের জনপদবাসী এই ত্রিবিধ প্রজাই, কী দুর্বলতা, কী দুরাহার ও বহু অত্যতায় কাক, চটক ও বরাবত সদৃশ। বঙ্গজাতি অতি প্রাচীন জাতি। রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গ ও সুম্ম নাম বহুবার উল্লেখ হয়েছে। রাঢ়বঙ্গ গঙ্গারিডমে উল্লিখিত হয় মৌর্য সাম্রাজ্যের কালে। এই গঙ্গা বিতয়ের রাজধানী গঙি (গাঙ্গে)। এই গঙ্গি পরবর্তীকালে সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম বন্দর নামে পরিচয় পায়।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন, সমুদ্র থেকে উন্নীত নদীবিধৌত জলাভূমি ক্রমশ বাণিজ্য ও কৃষিকাজে উন্নততর হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক সপ্তগ্রাম বন্দর ও বলাগড় বন্দরের কাছেই গ্রাম খন্যান। খনন অর্থাৎ মাটি খোঁড়া; এই সকল স্থানে মাটির নীচে বালি পাওয়া যেত যা পরবর্তীকালে ইমারতী কাজে ব্যবহৃত। এই 'খনন' থেকেই 'খন্যান' নামের উৎপত্তি ধরে নেওয়া হয়। আমাদের আলোচনা ভূ-প্রকৃতি নয়। এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করা মহান পুরুষ ভবানীচরণ। বিধাতা বোধহয় ভাগ্য লিখনকালে দুঃখ আগে লিখে ফেলেছিলেন। কারণ পরের বছরই (১৮৬২) মাতৃ বিয়োগ। দুধের শিশু মাকে বোঝার আগেই শূন্যতায় ভাসল। স্বল্পায়ু জীবন। মাত্র ছেচল্লিশ বছর। মৃত্যু ২৭ অক্টোবর, ১৯০৭ সাল। ১৮৬১ সালের কথা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই— বঙ্গ তথা ভারতবর্ষ এক উত্তাল সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। ইংরেজ বণিকের 'মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'। মাতৃভূমির লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারছে না যুবসমাজ— জন্ম নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, অক্ষয় কুমার মৈত্রের

মতো পুরুষেরা, যাঁরা বরবর্তী পর্যায়ে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন এবং মানুষের দুর্দশা মোচনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। গড়তে চলেছিলেন এক নতুন সমাজ, যে সমাজের রাজদণ্ড নয়— মুক্তিই ছিল বীজমন্ত্র। একনিষ্ঠ হিন্দু পরিবারে জন্ম ভবানীচরণ বাবার অভিভাবকত্বে শুরু করলেন শিক্ষা চর্চা, তার সঙ্গে চলতে থাকে পূজার্চনা, দেব-দেবী, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিশ্বাস নিয়েই।

শিক্ষা শুরু গ্রামের (খন্যানের) পীতাম্বর পণ্ডিতের পাঠশালায়। পরবর্তীকালে চুঁচুড়া হিন্দু স্কুল; হুগলী ব্রাহ্ম স্কুল; কলকাতা জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন; হুগলী কলেজিয়েট স্কুল; হুগলি মহসিন কলেজ। এন্ট্রান্স পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় ভর্তি হলেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে। বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ। এখানে এসে শিক্ষক হিসেবে পেলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ। এদের নেতৃত্বে সমগ্র বঙ্গে উঠেছে জাতীয়তার ঢেউ। ভবানীচরণ এদের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর মাথায় 'পোকা' নড়ে উঠল। সেই ছটফটানি দেশোদ্ধারে। সেই ছটফটানি যে কত তীব্র ও মারাত্মক তা তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যাবে। তিনি সমাজের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ে অবস্থান করেছেন, কিন্তু কোথাও সুস্থির থাকতে পারেননি। মত পালটে আবার ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছেন।

কখনো তিনি ব্রাহ্ম মতে দীক্ষা নেন, কখনো ক্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টীয় মত গ্রহণ করেন। খ্রিস্টমত ভালো না লাগায় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নিয়ম, নিষ্ঠা, সংযম, সেবা ভালো লাগায় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। গ্রিকসন্ত থিওফিলোসের জীবন তাঁকে দারুণ ভাবে আকৃষ্ট করে। 'থিও ফিলোস' শব্দের বঙ্গানুবাদ 'ব্রহ্মবন্ধু'। এই নামটি পছন্দ হওয়ায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে গৃহস্থাশ্রমের নাম 'ভবানীচণ' ছেড়ে তিনি ব্রহ্মবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। খ্রিস্টীয় ক্যাথলিক মতে 'সন্ন্যাস' নেন, নিজেকে গৈরিক বস্ত্রধারী ভারতীয় ক্যাথলিক বলে পরিচয় দেন। বন্দ্যোপাধ্যায় পদবির 'বন্দ্যো' বাদ দিয়ে শুধু উপাধ্যায় বা 'শিক্ষক' পদবি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে 'ব্রহ্মবন্ধু' নামও পরিবর্তন করে 'ব্রহ্মবান্ধব' বা 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' নাম ব্যবহার করেন। এক সময় দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে কিছুদিন গিয়েছিলেন। এতক্ষণের আলোচনায় মনে হতে পারে স্বধর্ম ত্যাগী আবার কীভাবে মাতৃভূমির মুক্তি জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমরা তাঁর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখি জীবনের শেষ দিকে ৭ অক্টোবর ১৯০৭ সালে প্রায়শ্চিত্ত করে উপবীত ধারণ করে হিন্দুত্বে ফিরে আসেন। ৭ অক্টোবর ছিল মহালয়ার দিন। এই বিতর্কিত পরাবর্তনে এগিয়ে এসে সাহায্য করেছিলেন ভাটপাড়ার পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন।

এবারে একটু আলোকপাত করা যাক কর্মজীবনের দিকে। অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে এসে অস্থিরতা খুব বাড়ে। হয়তো-বা জানতেন তার আয়ুষ্কালের সময়সীমা। তাই সবেতেই অস্থিরতা। বলে উঠলেন 'ফ্রিডম নট থ্রু পেন বাট থ্রু সোর্ড।' যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য ছুটলেন স্বাধীন রাজ্য গোয়ালিয়র। সময় ১৮৭৮ সাল। ১৮৮০ সালে ফিরে এসে বর্ধমানের মেমারি স্কুলে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। এখানেও স্থির থাকতে পারলেন না। ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করলেন পত্রিকার সম্পাদনা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিতে থাকেন। ১৮৯২ সালে লিখলেন 'Was Luther a reformer'। 'A Tract on the existence of God' নামে নিজের ধর্ম জীবনের ইতিহাস লেখেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে স্বরাজ গঠনের স্বপ্ন দেখাতে থাকেন ভারতবাসীকে।

ইংরেজ শাসক তাঁর তেজস্বী বক্তৃতা ও লেখায় সন্তুষ্ট ছিল না। তাকে গ্রেপ্তারবরণও করতে হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে 'সোফিয়া' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে 'বাঙ্গলার বিশ্বকবি' (the world poet of Bengal) বলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন। রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য নিয়ে তিনি একটি সমালোচনাও লেখেন, যা রবীন্দ্রনাথকে 'গীতাঞ্জলি' লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। পরবর্তীকালে 'গীতাঞ্জলি' নেবেল পুরস্কার পায়। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন। তিনিই প্রথম আশ্রমিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' উপাধিতে ভূষিত করেন। যা রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন।

১৯০৪ সালে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৬ সালে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা এবং ১৯০৭ সালে 'স্বরাজ' পত্রিকা শুরু করেন। তাঁর সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনে নব্য জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান প্রচারপত্র হয়ে ওঠে। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু মানুষ স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথনাথ মিত্র, বারীন ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিন পাল প্রমুখ। তার লেখনী ও কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার জন্য ব্রিটিশরা তাকে বন্দি করে রাখতে চাইলেও সে সুযোগ পেল না। ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে অসুস্থ হয়ে ক্যাম্পবেল (বর্তমানে নীলরতন) হাসপাতালে ভর্তি হন। ওই বছরই ২৭ অক্টোবর ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বন্দে মাতরম ধ্বনি ও স্বদেশি গ্রহণের সংকল্পের মধ্যে দিয়ে নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর পার্থিব শরীর ভস্মীভূত হয়।

বাংলা সংবাদপত্রের পথিকৃৎ ও অন্যতম স্রষ্টা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (আমাদের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) এই ভাবেই বঙ্গ তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তার স্থান চিরস্থায়ী করে রাখেন। প্রকৃত সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক ও জাতীয়তাবাদে উত্তাল ঢেউ তোলা মহান পুরুষ ভবানীচরণকে আমাদের খন্যানের সন্তান বলে স্মরণ করি। □

গীতা ধর্মের চেয়েবেশি জীবনের কথা বলে তাই গীতা বিশ্বমানবতার জীবনদর্শন —স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ

স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এক তেজস্বী সন্ন্যাসী। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে কেন্দ্র করে তাঁর মানব সেবা এবং হিন্দু জাগরণের সঙ্গে এলাকার মানুষ পরিচিত। এলাকার মানুষের কাছে তিনি পরিত্রাতাস্বরূপ। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে- আপদে তিনি সদা তৎপর। আগামী ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ সমিতির তিনি সভাপতি। স্বস্তিকা পত্রিকার পক্ষে অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠের বিষয়ে তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। —স্বঃ সঃ

□ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সমবেত গীতা পাঠের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য যদি একটু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন।

● ভারতবর্ষ সাধনা ও সংস্কৃতির এক মিলনক্ষেত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাহিনির মৌখিক ধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারত ভূখণ্ডে বহমান। আমরা জানি 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। যখন ভারত পরাধীন ছিল তখন বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে গীতা ছিল অনুপ্রেরণা স্বরূপ। গীতাপাঠ করে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি তাঁরা গলায় নিয়ে বীরগতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। পুণ্যভূমি, দেবভূমি, তপোভূমি, মোক্ষভূমি এই ভারতবর্ষ। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে অরাজকতা, অন্যায়ের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে তা নিশ্চয় আমাদের কারও অজানা নয়। এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে রাজনীতি। ফলে মানুষ ক্রমশ অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র গীতা অনুধ্যান। তাই পশ্চিমবঙ্গে সমবেত গীতাপাঠের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গীতা মাহাত্ম্যে রয়েছে—

'যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনংপাঠনং তথা।

মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ।।'

গীতা পাঠ, গীতার বিচার-বিশ্লেষণ, গীতা অনুধ্যান যেখানে হয়, শ্রীভগবান সেখানে প্রমোদিত হন। ভারতভূমি যেন 'ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে'– এই আদর্শে ফিরে যেতে পারে এই উদ্দেশ্যেই গীতা পাঠের এই মহতী কার্যক্রম।

□ এই কার্যক্রম শুরুর প্রেক্ষাপটটি কী?

● এই কার্যক্রম শুরুর ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। পশ্চিমবঙ্গে গত বছর আয়োজিত হয়েছিল কুম্ভমেলা এবং মায়াপুরে গীতা যজ্ঞ সমাবেশ। সন্তমণ্ডলী ও সনাতনীদের, এই কাজে লক্ষ্য করার মতো। যে উদ্দেশ্যে এই আয়োজন তা হলো এই আত্মবিস্মৃত হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং বহুধাবিভক্ত হিন্দু জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যস্থাপন। এই লক্ষ্যে কিছুটা সফল হওয়ায় এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন।

□ এই কার্যক্রম আয়োজনের ক্ষেত্রে আপনারা কী কী বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন?

● এই কার্যক্রম কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। তবুও কোনো কোনো মহল থেকে রাজনীতির দাগ লাগানোর চেষ্টা চলছে। একে বিজেপির কর্মসূচি বলেও প্রচার করা হচ্ছে। গীতা হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। গীতা ধর্ম সম্বন্ধে যা বলে তার চেয়ে অনেক বেশি জীবনের কথা বলে। গীতা বিশ্ব মানবতার প্রকৃত জীবন দর্শন। গীতার বাণী ও উপদেশ অনুসরণ করে চললে সার্থক জীবন যাপন করা যায়। তবুও এই

ফঃ ৫

কর্মসূচির সফল রূপায়ণে কিছুটা বাধা দেওয়া চলছে। সেই দিন প্রাইমারি টেট পরীক্ষার দিন ঘোষিত হয়েছে। হয়তো বহু ইচ্ছুক সনাতনী অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তবে এতবড়ো কর্মসূচিকে রুখে দেওয়া অত সহজ নয়। ধর্মের শিকড়ে টান পড়লে মানুষও একদিন এদের শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেবে।

□ এই বছর 'লক্ষ সনাতনীর' সমবেত গীতা পাঠের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য কী? লক্ষ সনাতনীকে আহ্বানের বিশেষত্ব কী?

● লক্ষ সনাতনীর সমবেত 'গীতা পাঠে'— সংখ্যাটি আসলে সাধারণ ও নগণ্য। হিন্দু-সনাতনীদের সকলকে ডাকলে সংখ্যাটা কয়েক কোটিতে দাঁড়াবে। আসলে ভারতবর্ষে কত হিন্দু রয়েছেন তার সঠিক হিসাব করা কঠিন। সকল হিন্দুরাই জানেন, গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশাবলী। গীতার উপদেশ মেনে চলা মানে জীবনে সর্ব দুঃখের অবসান। গীতার উপদেশ মেনে চললে উচ্চ আদর্শের জীবনযাপন করা যায়। তাই গীতা পাঠের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। হাজার হাজার বছর আগে ভারতভূমিতে রচিত মহাভারতের মতো মহাগ্রন্থের অন্তর্গত এই বাণী সেদিনকার মতো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। মানবসমাজকে তা আজও করে অনুরণিত। এই বাণীকে বিচার করা হয় বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে। সনাতনীদের আহ্বানের কারণ হলো যে তারা গীতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং তার মাহাত্ম্য ও মর্মার্থও বোঝেন। সঠিক বোধ নিয়েই তারা এই কার্যক্রমে অংশ নেবেন।

□ বিগত বছর মায়াপুরের সমাবেশে কতজন অংশগ্রহণ করেছিলেন?

● বিগত বছরে মায়াপুরে ছয় হাজারেরও বেশি মানুষের সমাবেশ হয়েছিল।

□ এবছর আয়োজিত অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ রূপরেখা কী?

● এই বছর আগামী ২৪ ডিসেম্বর

২৫.৮.১৯৭৮ সালে ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত 'গীতা স্মারক ডাকটিকিট।'

কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক হলো--- 'সনাতন সংস্কৃতি সংসদ', 'মতিলাল ভারততীর্থ সেবা মিশন আশ্রম', 'অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ'। এই মহতী অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সকলেই আগ্রহী এবং আমরাও আশাবাদী। সকলের জন্য শুকনো খাবারের প্যাকেট এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। এটুকু বিশ্বাস আছে সেদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড 'ধর্মক্ষেত্রে' পরিণত হবে। আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত। বাকিটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

□ ভারতের ও ভারতের বাইরে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই মহতী কার্যক্রম কী বার্তা বহন করবে?

● মহাজাগরণ ও মহামিলনের মধ্য দিয়ে যে মহামুক্তির ডাক এই মহতী কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য খুবই পরিস্কার। বহুধাবিভক্ত হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করা। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হিন্দুমনস্ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন এবং এক সমন্বয়ী রূপকে সামনে নিয়ে আসা। 'হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থ আছে, ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে, কেবল নাই শুধু সংহতি শক্তি। এই সংহতি শক্তি জাগিয়ে দিলে হিন্দু জাতি অজেয় হয়ে দাঁড়াবে'— গুরু মহারাজের এই বাণীকে আমরা বাস্তবায়িত করতে চাই। আগামীদিনে এই হবে আমাদের প্রধান বার্তা। 'সঙ্ঘেশক্তি কলৌযুগে'—বর্তমানে কলিযুগে সঙ্ঘশক্তি অর্থাৎ সংগঠিত মানবশক্তি অসাধ্য সাধন করতে পারে। তাই জাগ্রত ও সচেতন মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই রুখে দাঁড়াতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমগ্র দেশের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে 'একের অনলে বহুরে আহুতি' দিয়ে সচেতন নাগরিক সমাজকে এই মহাসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে অরাজনৈতিকভাবে।

□ এই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্যজীকে আমন্ত্রণের গুরুত্ব সম্পর্কে যদি একটু আলোকপাত করেন।

● ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে আমন্ত্রণ জানানো সঠিক ও উপযুক্ত কাজই হয়েছে। আমিও গিয়েছিলাম নয়াদিল্লিতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। মাননীয় মোদীজী সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছেন এবং কথা দিয়েছেন তিনি আসবেন। মোদীজী অন্যতম বিশ্বনেতা এবং হিন্দুত্বের মুখ। তাঁর উপস্থিতিতে সারা বিশ্বে এই মহতী অনুষ্ঠান এক আলাদা মাত্রা পাবে।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য সদানন্দজী মহারাজ তো হিন্দু কুলতিলক। তাঁর উপস্থিতি সকলকে অনুপ্রাণিত করবে, ঋদ্ধ করবে। তাই এই দুই মহামান্য অতিথিকে আমন্ত্রণের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে বই কী।

□ কার্যক্রমের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে হিন্দু সমাজের প্রতি কোনো আবেদন বা পরামর্শ?

● হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম। হিন্দুধর্ম চিরন্তন, চিরভাস্বর। এই ধর্ম গৌরবের, শ্রদ্ধার, অহংকারের, স্বাভিমানের। হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। স্বগর্বে বলো 'আমি হিন্দু'। আমি হিন্দু, আমি হিন্দু, আমি হিন্দু'--- এই আমাদের জপমন্ত্র। এই মন্ত্র হিন্দুদের জপ করাতে চাই। ভারতবর্ষ বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ

সভাপতির বার্তা...

'পশ্চিমবঙ্গ' তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত পবিত্রভূমি যা ভারতের একটি অন্যতম প্রধান রাজ্য—যা বহু বছর ধরে সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাসের সাথে সাথে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য বহন করে আসছে। এই পবিত্র বঙ্গভূমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দের মতো আরও অনেক মহাপুরুষদের জন্ম তথা কর্মভূমি।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের এই পবিত্রভূমির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। আমরা আমাদের গৌরবময় অতীতকে ভুলে গেছি। এমতাবস্থায় আমাদের অদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত।

এই পরিস্থিতিতে একমাত্র 'গীতা'র শরণাপন্ন হলেই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে পারে। তাই বর্তমান সময়ের আহ্বানে, সমবেতভাবে সকল মঠ-মন্দির, আশ্রম, বিবিধ সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার গীতানুরাগী মানুষেরা 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছেন।

সকল সনাতনী গীতানুরাগী মানুষের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা সক্রিয়ভাবে এই ভব্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করে এই ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন।

—স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)
সভাপতি, লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অর্গানাইজিং কমিটি

সব মানুষ যে যার নিজের ধর্ম পালন, স্বাধীন ধর্মাচরণ করতে পারবে। কিন্তু হিন্দু হয়ে হিন্দুদের কেউ ছোটো করবেন না। হিন্দুদের গালি দিয়ে নিজের ধর্মকে ছোটো করে ধর্মনিরপেক্ষ, উদার হওয়ার দরকার নেই। আজ যে অবক্ষয় চলছে তাতে হিন্দুধর্ম বিকশিত হবে না, দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। এই প্রবণতা ঠেকাতে হবে। ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে হবে। কারণ ধর্ম মায়ের মতো। ধর্মের থেকে কোনো কিছুই বড়ো হতে পারে না। ধর্মই তো জীবনকে সুপথে চালিত করে, তাকে ধারণ করে। সব হিন্দুদের কাছে অনুরোধ সগর্বে মাথা উঁচু করে ধর্ম পালন করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিন। তিনিই রক্ষা করবেন। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'--- তিনিই তো বলেছেন। ক্লীবতা নয়, দুর্বলতা নয়, ভয় নয়, লজ্জা-সংকোচ নয়, চাই বীরত্ব, পৌরুষত্ব, সাহস। তবেই হিন্দু অগ্রসর হতে পারবে।

গুরু মহারাজজী যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন— 'সতত মনে রাখিবে যে, এই দেহ কামকাঞ্চন ভোগ করিবার জন্য নহে। এই দেহ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির লীলাক্ষেত্র। তাই সতত ভাবিবে— আমার নাই রিপুর উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন, নাই মায়া-মোহ-পাপ-তাপ- ভ্রম-ভ্রান্তি। আমি পবিত্রতা ও ত্যাগের জ্বলন্ত, জীবন্ত প্রতিমূর্তিস্বরূপ'।

◻ গীতা পাঠের এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আগামী দিনে কী পরিকল্পনা?

● গীতা পাঠের এই অভ্যাস আগামীদিনেও চলবে। একদিন নয়, প্রতিদিন, সারা বছর ধরে। অনেক পরিবারে নিয়মিত গীতা পাঠ করা হয়। কোথাও কয়েকটি শ্লোক, কোথাও-বা একটি অধ্যায়। অনেকেই গীতা পাঠ করেন পরম আনন্দে, গৌরবে। গীতার সারমর্ম যেদিন মানুষ সঠিকভাবে অনুধাবন করবেন সেদিন নিজেরাই নিয়মিত গীতাপাঠ ও অনুধ্যান করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তো বলেছেন—

'গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্।।'

তাই কোনও পরিকল্পনা নয়। মানুষ যুগ যুগ ধরে কালে কালে গীতার বাণী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও তার মর্মার্থ বয়ে নিয়েই চলবে। গীতা অমর, অনন্ত, অক্ষয়। মানুষ এর মর্মার্থ বুঝবেই বুঝবে। কারণ গীতা হলো জীবন দর্শন। বহতা নদীর মতো গীতাপাঠের এই স্রোত চলবে।

আগামী দিনে এই অনুষ্ঠানকে মাথায় রেখে কীভাবে সম্মিলিতভাবে বৃহত্তর কার্যক্রমের আয়োজন করা যায় তা চিন্তাভাবনা করে পরে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে। গুরু মহারাজজীর বাণী নিরন্তর স্মরণ করা আবশ্যক— 'মানব জীবনের চরম লক্ষ্য সাধন— ভগবল্লাভের জন্যই তো দেহধারণ, আর সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য উদ্‌যাপনেই তো ইহার চরম সার্থকতা। অন্য কিছু করিয়া জীবন অতিবাহিত করিলে তো দেহধারণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।' ◻

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা শুধু ধর্মশাস্ত্র নয়, এক বিশ্বজনীন সাহিত্য

গোপাল চক্রবর্তী

বিশ্বসভ্যতা ও সাহিত্যে ভারতের শ্রেষ্ঠদান শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতির নির্যাস এই দিব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায়— 'ভারতের কুটীরে দীর্ঘ দিবসের তৈলহীন প্রদীপের জ্বলন্তশিখা এই গীতা।' রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ধনিক শ্রেণী, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, তথা সম্প্রদায় বিশেষের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এই গ্রন্থ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনসাহিত্য।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা কালক্রমে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। গীতা ভারতীয় ধর্মসাধনা ও অধ্যাত্ম ভাবনার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। গ্রন্থকারের মতে এর প্রকৃত নাম ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ এবং আলোচ্য বিষয় হলো ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র। অবশ্য শঙ্করাচার্য, শ্রীধরস্বামী, রামানুজ প্রমুখ প্রাচীন টীকাকারগণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ভগবদ্‌গীতা বা গীতা নামে গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে গীতা মহাভারতের অংশ সুতরাং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবই এর রচয়িতা। ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত গীতার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭০০। এই জন্য শ্রীশ্রী চণ্ডীর মতো গীতাকেও 'সপ্তশতী' বলা হয়।

সামগ্রিক বিচারে গীতায় সাংখ্যযোগ, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি এবং মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের সমন্বয় সাধিত, দ্বৈত, অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত কোনও বিশেষ দার্শনিক মত বা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নয়। গীতায় বৈদিক ধর্মের অনুসারী শ্রৌত অনুষ্ঠানাদির ব্যবহারিক মূল্য স্বীকৃত হলেও অধ্যাত্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব হ্রাস করা হয়েছে। ভক্তির আদর্শমনন্বিত কর্মতত্ত্ব যেমন প্রশংসিত, তেমনি জ্ঞান মার্গের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকৃত। বহু দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে আচরিত যজ্ঞ উপাসনা, ব্রত প্রভৃতির লৌকিক ফলশ্রুতি ঘোষিত, উপনিষদুক্ত দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি বিবিধমার্গ, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, জন্মান্তরতত্ত্ব, বৈচিত্র্যের মাধ্যমে অদ্বৈতোপলব্ধি, কর্মসাধনা, সন্ন্যাস, কৃষ্ণ, ভাগবত ও বৈষ্ণবমতের সমন্বয়, ভগবদ্‌ভক্তি ও নীতিধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত।

গীতাশাস্ত্রে মানুষমাত্রেরই অধিকার আছে। কোনও ব্যক্তি যে কোনো ধর্ম, বর্ণ ও আশ্রমে স্থিত হলেও তাঁর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিযুক্ত অবশ্যই হওয়া উচিত। গীতায় স্বয়ং ভগবান বলেছেন যে, 'স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র ও পাপযোনিবিশিষ্ট মানুষেরাও সৎপরায়ণ হয়ে পরমগতি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন (৯/৩২) এবং নিজেদের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা আমার পূজা করে মানুষ পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে (১৮/৪৬)। এইসব কথা বিচার করলে এই জ্ঞান হয় যে পরমাত্মার প্রাপ্তিতে সকলেরই অধিকার আছে। ধনী-দরিদ্র, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, স্ত্রী-পুরুষ, ত্যাগী-ভোগী, সৈনিক-প্রশাসক প্রত্যেকেই আপন আপন মার্গে গীতা থেকে পাথেয় সংগ্রহ করতে পারেন। ইংরেজ মনীষী কার্লাইল মার্কিন মনীষী এমার্সনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে গীতাগ্রন্থ উপহার দিয়ে উভয়ের সৌহার্দ্য সুদৃঢ় করেছিলেন।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে গীতার অনন্য সাধারণ ভূমিকা অবিস্মরণীয়। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ, আত্মসমর্পণ যোগ, আত্মতত্ত্ব যোগ তথা স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ মুখ্যত আমাদের মুক্তি সংগ্রামীদের জীবন পরিচালিত করেছিল। ভারতের বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা তথা পাথেয় ছিল এই গীতা। আবার অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও গীতার বাণীতে প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

আজ থেকে ৫৫০৭ (খ্রি:পূ. ৩৪৮৯) বছর আগে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী (মোক্ষদা ত্রয়োদশী) তিথি ভরণী নক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে লীলা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন। তাই এই মহিমামণ্ডিত তিথিতে 'গীতা জয়ন্তী' পালন করা হয়। এই যুদ্ধ ১৮ দিন স্থায়ী হয় এবং যুদ্ধ শেষ হয় অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে। জ্ঞানী ও সংযতচিত্ত সঞ্জয় ছিলেন ব্যাসশিষ্য। মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপায় তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, ফলে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে কী ঘটেছে তা তিনি দর্শন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই তিনি হস্তিনাপুরের মহারাজ জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন।

প্রস্থানত্রয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে— উপনিষদ্ সমূহকে বলা হয় শ্রুতি প্রস্থান, ভগবদ্‌গীতাকে বলা হয় স্মৃতি প্রস্থান, ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয় ন্যায়প্রস্থান আর গীতা হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের নির্যাস স্বরূপ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বিশ্বের সমস্ত ধর্মগ্রন্থ এবং সাহিত্যের মধ্যে এক অতীব ভাস্বর ও নির্মল হীরকখণ্ড। এই গ্রন্থ জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে আত্মবিদ্যার গূঢ় ও পবিত্র তত্ত্ব সংক্ষেপে ও অসন্দিগ্ধরূপে বিবৃত করে সেই সকল তত্ত্বের উপর মানুষের পুরুষার্থ বা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থার পরিচয় করিয়ে দেয়। জ্ঞান ও ভক্তিকে মিলিয়ে উভয়কে শাস্ত্রসম্মত ব্যবহারের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং এর দ্বারা সংসারের দুঃখক্লিষ্ট মানুষকে শান্তি প্রদান পূর্বক নিষ্কাম কর্তব্যাচরণে প্রবৃত্ত করে। গীতার মতো এরূপ সরল প্রাঞ্জল দ্বিতীয় গ্রন্থ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে কেন বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। সংস্কৃত কাব্যধারার তিনটি শ্রেণীর মধ্যে গীতাকে নিঃসন্দেহে উত্তম শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। কারণ এতে আত্মজ্ঞানের অনেক গহন সিদ্ধান্ত আবালবৃদ্ধের নিকট বোধগম্য বিশদ সহজ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে এবং তা জ্ঞানসমন্বিত ভক্তিরসে পূর্ণ।

বৈদিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় শুধু নয়, অন্যান্য ধর্মেরও বহু বিদগ্ধ চিন্তাশীল মানুষের কাছেও এই গ্রন্থ শত শত বছর ধরে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মান্যতাপ্রাপ্ত হয়ে আসছে। এই গ্রন্থের মহত্ত্বই এর মূল কারণ। গীতা মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে—

'সর্বোপানিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।

মেদিনীপুরে সরকারি স্কুলে প্রথম অত্যাধুনিক পানীয় জল প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জলের অপর নাম জীবন। আইআইটি খড়্গাপুরের রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগের উদ্যোগে এবং খড়্গাপুরের মেটালিক ফুয়েল প্রাইভেট লিমিটেডের আর্থিক আনুকূল্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই প্রথম কোনো সরকারি বিদ্যালয়ে (বা, সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে) তৈরি হলো অত্যাধুনিক পানীয় জল প্রকল্প। যার নাম দেওয়া হয়েছে— মাল্টি ফিল্টার্ড ইউভি ট্রিটেড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফেসিলিটি (Multi Filtered UV Treated Drinking Water Facility)। গত বছর, ৫ আগস্ট খড়্গাপুর শহরের উপকণ্ঠে সালুয়া সংলগ্ন গোপালী ইন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আইআইটি খড়্গাপুরের রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. সোমনাথ ঘোষাল, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (সাব-ইন্সপেক্টর) দোলন চাঁপা মান্না, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অর্পিতা পড়্যা দাশ এবং মেটালিক ফুয়েল প্রাইভেট লিমিটেডের শীর্ষ আধিকারিকবৃন্দ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অর্পিতা পড়্যা দাশ বলেন, ‘আইআইটি খড়্গাপুরের রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগের উদ্যোগে তথা তাঁদের প্রযুক্তি ব্যবহার করেই এই পানীয় জল প্রকল্প নির্মিত হয়েছে। বিভাগের অধ্যাপক ড. সোমনাথ ঘোষালের কৃতিত্ব অপরিসীম। একইসঙ্গে, মেটালিক ফুয়েল প্রাইভেট লিমিটেডের আর্থিক সহায়তা ছাড়া এই প্রকল্প তৈরি হতো না। পুরো খরচ-ই তাঁরা বহন করেছেন।

উদ্বোধনের দিন সংস্থার কলকাতার আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন’। তিনি এও জানিয়েছেন, মাত্র ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে ২০০০ লিটার জল পরিশুদ্ধ এবং মিনারেল যুক্ত হবে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পানীয় জল প্রকল্পের মাধ্যমে। এর আগে, খড়্গাপুর গ্রামীণ এলাকার গোপালী সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের জন্য আইআইটি খড়্গাপুরের থেকে এই ধরনের প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু, জেলার কোনো বিদ্যালয়ে এই ধরনের প্রকল্পের উদ্বোধন এই প্রথম।

এই ধরনের উন্নত মানের গবেষণার দ্বারা অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান সম্ভব। শুদ্ধ, পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প নির্মাণের দিশায় একজন বাঙ্গালি বিজ্ঞানীর এই গবেষণা এবং তার সার্থক রূপায়ণ এই প্রজন্মের সব ছাত্র-ছাত্রীর কাছে এক আলোকবর্তিকা, যা তাদের আগামী দিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে, ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা ও সংকট নিরসনে উদ্বুদ্ধ করবে।

সুড়ঙ্গ

স্কুল থেকে প্রতিবারই শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়া হয়। কোনোবার ঐতিহাসিক স্থান, কোনোবার ভৌগোলিক স্থান, কোনোবার শুধুই বিনোদনের জন্য। এবারও বিনোদনের জন্যই যাওয়া হচ্ছে দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে ঝরনার ধারে। একটা বড়ো বাস ভাড়া করা হয়েছে। এবার উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাই শুধু যাচ্ছে। সঙ্গে চারজন শিক্ষক আছেন। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ছাত্ররা আনন্দে আত্মহারা। দুজন ছাত্র সপ্তপদী সিনেমার উত্তম-সুচিত্রার গান ধরল— 'এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলোতো'। সারা বাস নিঃশব্দ। গান শেষ হতেই সবাই হাততালিতে ফেটে পড়ল। স্যারেরা ওদের দুজনের খুব প্রশংসা করে আর একটি গান গাইতে বলতেই সামনে এক পাহাড় নজরে পড়ল।

বাসটি একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেল রাস্তাটা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে। বাস সুড়ঙ্গের একেবারে কাছে আসতেই দেখা গেল রাস্তার পাশে লেখা রয়েছে 'সুড়ঙ্গের উচ্চতা ১২ ফুট'। ড্রাইভার সামনে বসা স্যারকে বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের বাসের উচ্চতাও ১২ ফুট। আমি অনেকবার এই রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করেছি।

বাস সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতেই প্রচণ্ড শব্দে আর ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। সবারই মুখে আর মাথায় অল্পবিস্তর লেগেছে। ছেলেরা ভয়ে চিৎকার করছে। কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করেছে।

স্যারেরা বললেন, সবাই বাসেই বসে থাকো। কেউ নামবে না। ড্রাইভার, কন্ডাক্টর আর স্যারেরা নেমে পড়লেন। ড্রাইভার বললেন, কেন এমন হলো বুঝতে পারছি না। দেখতে দেখতে পেছনে গাড়ির সারি লেগে গেল। একজন স্যার গাড়িগুলিকে ধীরে ধীরে পেছনে নিয়ে যেতে বললেন। সবাই নিজের নিজের গাড়ি পিছিয়ে একটু দূরে রেখে সুড়ঙ্গের মুখে এসে ভিড় করতে শুরু করল। নানা জনে নানা পরামর্শ দিতে লাগল। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ফিরছল একজন, তিনি বললেন, কয়েকদিন আগে রাস্তাটা পাকা হয়েছে, তাতে রাস্তার স্তর একটু উঁচু হয়েছে আর তাই এই বিপত্তি ঘটেছে।

বাসের পেছনে যে গাড়িটি ছিল তার ড্রাইভার ফেঁসে যাওয়া বাসটির পেছনে মোটা রশি নিজের গাড়িতে বেঁধে টানার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সেই মোটা রশিও ছিঁড়ে গেল। কেউ বলল শাবল দিয়ে পিচ আর সুড়কির স্তরটা উঠিয়ে দিলেই হবে। একজন বলল বড়ো ক্রেন আনতে হবে।

বাসের মধ্যে বসে ছেলেরা সব কথাই শুনছিল। একজন ছাত্র হঠাৎ বাস থেকে নেমে সবার উদ্দেশে বলল, আচ্ছা, বাসের চারটি টায়ারেরই একটু করে হাওয়া বের করে দিলে কেমন হয়? তাহলেই তো বাসটি অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবে।

ছাত্রটির কথা শুনে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেল। তাইতো, একথা তো কারও মানে একবারও আসেনি। সঙ্গে সঙ্গে বাসের কন্ডাক্টর ছুটে গিয়ে বাসের চারটি চাকারই হাওয়া একটু করে বের করে দিতেই উপরটা ফাঁকা হয়ে গেল। বাসে সবাই উঠলে ড্রাইভার বাস চালিয়ে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে চলে গেল। বাসের ভেতরে আনন্দে ছেলেরা চিৎকার করে উঠল। একজন স্যার ওই দুই ছাত্রকে বললেন, তোমারা আবার ওই গানটি গাইতে শুরু করো। ছেলে দুটি গান ধরল— '... লাল লা লা লা... নীল আকাশের ওই দূর সীমা ছাড়িয়ে এই গান যেন যায় আজ হারিয়ে ....।'

ছোটো বন্ধুরা, ঈর্ষা, ঘৃণা, অহংকার, স্বার্থপরতা, লোভ ইত্যাদি আমাদের সবসময় ফুলিয়ে রাখে। আমরা যদি ভেতর থেকে এগুলিকে বের করে না দিই, তাহলে আমরা পদে পদে এরকম সুড়ঙ্গে আটকে যেতে পারি। আর এই হাওয়া বের করে দিতে পারলেই চলার পথে যে কোনো সুড়ঙ্গ থেকে আমরা সহজেই বের হয়ে যেতে পারবো।

(সংগৃহীত)

বীর বনবাসী

নগ্য মহাদয়া কাতকারি

জন্ম মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে। কাতকারি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষদের সংগঠিত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মহার সত্যাগ্রহ, জঞ্জিরা মুক্তি আন্দোলন, চরীর কৃষক হরতাল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। চিরনর আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জনজাতিদের প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদের অধিকারকে ব্রিটিশ শাসক বলপূর্বক হরণ করায় জনজাতিদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে। এর বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর চিরনর এলাকায় সত্যাগ্রহ শুরু হয়। নগ্য মহাদয়া কাতকারির নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক সত্যাগ্রহী অক্কাদেবী পাহাড়ে সমায়েত হন। অত্যাচারী ব্রিটিশ পুলিশ নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের গুলি চালিয়ে হত্যা করে। সেদিন নগ্য মহাদয়া কাতকারিরও মৃত্যু ঘটে।

এসো সংস্কৃত শিখি– ২

মহিলারা পরস্পর পরিচয় করার সময়

মম নাম সীতা

আমার নাম সীতা।

ভবত্যা নাম কিম্?

তোমার নাম কী?

মম নাম আলোলিকা। মম নাম অপর্ণা। মম নাম আরুশি। মম নাম ঈপ্সিতা। মম নাম জয়া। মম নাম রত্না। মম নাম রেণু। মম নাম মাধুরী। মম নাম ....। মম নাম ...।

এভাবে নিজের নিজের নাম বলতে হবে।

ভালো কথা

লালির বাচ্চা

দুবছর আগে লালি দাদুর পেছনে পেছনে আমাদের বাড়ি এসেছে। তারপর বড়ো হয়েছে। এখন আর শুধু আমাদের একার লালি নয়। পাড়ার সবার লালি। সবাই ওকে ভালোবাসে। ওর পেট বড়ো দেখে ঠাকুমা একদিন বলল ওর বাচ্চা হবে। গত সপ্তাহে একদিন সকালে আমাদের বাড়ির উঠোনে এসে কুইকুই করে মায়ের পায়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করে। মা গোয়ালঘরের খড়কুটোর উপর একটা বস্তা পেতে দিতেই শুয়ে পড়ল। দুপুরে মা বলল ওর তিনটে বাচ্চা হয়েছে। আমি রোজ একবার করে ছানা তিনটেকে দেখে আসি। এখনো চোখ ফোটেনি।

পিয়ালি মাহাত, সপ্তম শ্রেণী, নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীত-বৃষ্টি

সায়ন্তিকা সেন, নবম শ্রেণী, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

দক্ষিণেতে মিগজাউমে
ভাসল জলে চেন্নাই
দুদিন পরে পশ্চিমবঙ্গে
ঝমঝম বৃষ্টি যাচ্ছেতাই।
রাতের বেলা মেঘ করল
জাঁকিয়ে এল শীতও
শীত-বৃষ্টির সহযোগে
বেরিয়ে পড়ল লেপও।

ঝমঝমিয়ে পড়ছে বৃষ্টি
কী মজারে ভাই
দুপুরবেলা খিচুড়ি খাওয়া
স্কুলের তাড়া নাই।
ভাই বলছে হোক না বৃষ্টি
আরও দুদিন ধরে
স্কুল নাই পড়া নাই
কাটাবো মজা করে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

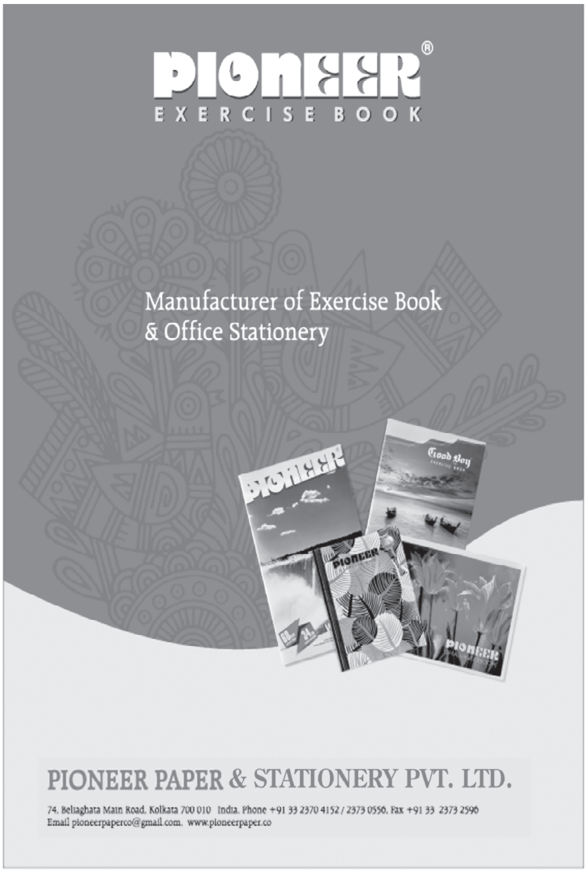

With Best Compliments from -

A

Well wisher

রাসায়নিক সার মন্থর বিষ

জৈব কৃষির কোনো বিকল্প নেই

দুর্গাপদ ঘোষ

প্রাকৃতিক বা জৈব কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে দেশের নরেন্দ্র মোদী সরকার। এই লক্ষ্যে নীতি আয়োগ 'ভারতীয় কৃষি পদ্ধতি স্কিম' অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যকে মোটা টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেশ কিছু রাজ্য তা গ্রহণও করেছে। তবে প্রথম এগিয়ে এসেছে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। সে রাজ্যের মোট ৭৫ জেলার মধ্যে ৩৬ জেলার জন্য ২০২২ সালের ২৬ এপ্রিল কেন্দ্র সরকার প্রাথমিকভাবে ৮২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। মোদী সরকারের ঘোষণামতো 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষ্যে নীতি আয়োগের ব্যবস্থাপনায় যেসব কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো 'cow-based Natural Farming and Innovative Agriculture' বা গো-ভিত্তিক প্রাকৃতিক কৃষি।

মোদী সরকারের অনুদানের টাকায় উত্তরপ্রদেসে গত বছরই প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৮ হাজার ৬৭০ হেক্টর জমিকে প্রাকৃতিক কৃষির আওতায় আনা হয়। এক বছর বাদে এখনকার খবর হলো এই পদ্ধতিতে চাষবাস করে যেসব কৃষক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে ৭৫ হাজার টাকা পারিতোষিক রূপে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে ৩৮ হাজার ৬৮০ হেক্টর জমিকে জৈব কৃষির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সুফল লাভ করছেন ১ লক্ষ ৭৬ হাজারেরও বেশি কৃষক। বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যও ধাপে ধাপে কেন্দ্রের অনুদান নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছে অ-বিজেপি শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশও। নীতি আয়োগের সূত্র মোতাবেক

কেন্দ্র সরকার হেক্টর পইত ২১ হাজার টাকা অনুদান দিচ্ছে। এছাড়াও কৃষকদের 'উৎসাহ ভাতা' হিসেবে দিচ্ছে মাথাপ্রতি ২ হাজার টাকা। তাছাড়া মোদী সরকারের 'পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা' অনুযায়ী দেশে ৪৩ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি জমিতে চালু হয়ে গেছে জৈব কৃষি সেখানে কেবলমাত্র জৈব সার ব্যবহার করে ফসল ফলানো হচ্ছে। সুখের কথা হলো, দীর্ঘদিন ধরে যেসব কৃষক জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতেন তাঁদের অনেকেই এখন জৈব সার ব্যবহার করে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই নিবন্ধকার গত বছরের জানুয়ারি মাসে বারাণসীর খুব কাছেই একটা কৃষি খামারে আমন্ত্রিত হয়ে সারাদিন সেখানে থেকে নিজের চোখে জৈব কৃষির সাফল্য দেখে এসেছেন। ফসলের বাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছে। পালং থেকে কপি, পেঁপে থেকে পেঁয়ারা, কেবল আকারেই বড়ো নয় সুস্বাদুও অনেক বেশি।

গত বছর ২৬ এপ্রিলে নতুন দিল্লিতে নীতি আয়োগ প্রাকৃতিক তথা জৈব কৃষি বিষয়ক একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তাতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত। তিনি কৃষকদের আশ্বস্ত করে বলেন যে জৈব কৃষিতে আত্মনিয়োগেকারীদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। ক্ষেত্র বিশেষে, কোনো কোনো জমিতে কেবলমাত্র প্রথম বছরটায় উৎপাদন সামান্য কম হতে পারে। তবে চাষের খরচও অনেক কম হবে। কম হবে জলের এবং সারের খরচ। পরের বছর থেকে ফলস যথারীতি পূর্ণমাত্রায় বা বেশি মাত্রায় ঘরে উঠবে। নীতি আয়োগের অন্যতম সদস্য রমেশ চাঁদ ওই অনুষ্ঠানে অত্যন্ত আশার কথা ব্যক্ত করে বলেন, এখন ভারতবর্ষে কোনো খাদ্য সংকট নেই। অদূর ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। মোদী সরকার ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রতিমাসে ৫ কিলোগ্রাম করে চাল-গম বিতরণ করে যাচ্ছে। বিদেশেরও অনেক মানুষের জন্য ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে খাদ্যশস্য পাঠানো শুরু করেছে। কেন্দ্র সরকারে ভাণ্ডারে এখন পর্যন্ত মজুত রয়েছে যা আগে এতটা থাকত না।

সুতরাং পরীক্ষানিরীক্ষার এটাই উপযুক্ত সময়। গো-ভিত্তিক বা জৈব কৃষির মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি অটুট থাকে, জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা যাতে কমে বা বিনষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য ভারতের পরম্পরাগত কৃষির পুনরাবর্তন ঘটানোর উপযুক্ত সময়

হলো এটাই। উল্লেখিত দুই আধিকারিকের বক্তব্য ও আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে আরও যেসব রাজ্য এগিয়ে এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জগনমোহন রেড্ডির ওয়াই এস আর কংগ্রেস শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশ। শুরুতেই ভালো ফললাভ করায় রেড্ডি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২৪ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষেরও বেশি কৃষককে জৈবকৃষির আওতাভুক্ত করবে। অনুরূপভাবে এগিয়ে এসেছে বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস সরকারও। যদিও ওই রাজ্যে জৈবকৃষি শুরু করেছিল তৎকালীন বিজেপি সরকার। কিন্তু উল্লেখিত দুই রাজ্যের সরকার মোদী-বিরোধী কূটকচালির রাজনীতির মধ্যে প্রাকৃতিক কৃষির সাফল্যকে বলি দিতে এগিয়ে আসেনি। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানানো যেতে পারে।

এখন কথা হলো, মোদী সরকার তথা নীতি আয়োগ জৈব কৃষির ওপর এত বেশি জোর দিয়ে এই উদ্যোগ নিতে এগিয়ে এসেছে কেন? এর প্রথম উত্তর হতে পারে এটাই যে, যে কোনও জাতীয়তাবাদী তথা দেশ সচেতন সরকারের কাছে এটা আকাঙ্ক্ষিত যে তারা দেশের মাটি এবং মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন। সে নিরাপত্তা কেবল সীমান্ত রক্ষা কিংবা বহিরাক্রমণ প্রতিহত করাই নয়। দেশের অভ্যন্তরীণ তথা সার্বিক নিরাপত্তাও। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'মাতা ভূমি পুত্রোহম্ পৃথিব্যা'— ভূমি হলো মা এবং আমি তার সন্তান। প্রয়োজনীয় দোহনের বাইরে গিয়ে সাময়িক সুবিধাভোগের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমিকে শোষণ করলে নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক ভয়ানক পরিণতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে।

ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হলে জমির উর্বরতা শক্তি এবং মজুত জলের ভাণ্ডার যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা এখন বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণিত। যেসব দেশে বেশি মাত্রায় এই সার ব্যবহার করা হচ্ছে, বিশেষ করে স্পেন, গ্রিস পশ্চিমি দেশগুলো সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রতি দু'তিন বছর অন্তর জমিতে চাষ না করে হৃত উর্বরতা ফিরিয়ে আনার জন্য স্রেফ ফেলে রাখতে হচ্ছে। অন্যথায় সেসব জমিতে বেশি মাত্রায় সার প্রয়োগ করেও ঠিকমতো ফসল পাওয়া যাচ্ছে না। জমি কার্যত বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মতো দেশ যেখানে গবাদি পশুর সংখ্যা বেশি এবং রাসায়নিক সারের পাশাপাশি জৈব সারও ভালো মাত্রায় ব্যবহার হয়ে থাকে সেখানে জমি বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার মাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কিন্তু বেশি রাসায়নিক সার প্রয়োগের কারণে তার সম্ভাবনা ক্রমে নষ্ট হতে চলেছে।

আরও একটা বিপজ্জনক দিক হলো, রাসায়নিক, বিশেষ করে জীবাশ্ম-জ্বালানি ভিত্তিক সার ব্যবহার করা হলে তার অবধারিত অনুষঙ্গ হিসেবে কীটনাশকের মতো বিষাক্ত পদার্থও ব্যবহার করতে হয়। প্রতিক্রিয়ার ধ্বংস হয়ে যায় কীটপতঙ্গ যারা ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে পরাগ মিলন ঘটিয়ে গাছে গাছে সঠিক মাত্রায় ফল ফলাতে সাহায্য করে। কিন্তু এখন অনেক দেশেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে গাছে গাছে যে পরিমাণে ফুল বা মুকুল ধরছে সেই তুলনায় ফল ফলছে অনেক কম। এমনকী ভারতেও এই বিপর্যয়ের মেঘের ছায়া ঘনাতে শুরু করেছে অন্তত দু' দশক আগে থেকেই। এখন থেকে ২২ বছর আগে কলকাতার একটা নামকরা দৈনিক সংবাদপত্রে আঁতকে ওঠার মতো একটা ছবি প্রকাশ পেয়েছিল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর কাছে একটা সর্ষের ক্ষেতে ১০-১২ বছর বয়সি দুটো ছেলের ছবি। তারা সর্ষের ফুলেভরা গাছগুলোকে ধরে ধরে সযত্নে অন্য ফুলের ওপর নিয়ে গিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে পরাগ মিলন ঘটনানোর কাজ করছে যাতে সর্ষের ফলন ভালো হয়। মৌমাছি-প্রজাপতি ইত্যাদির কাজ করছে মানুষ। কারণ কীটনাশকের প্রভাবে মৌমাছি- প্রজাপতির দেখা মিলছে না। বলা বাহুল্য, এটা একটা মারাত্মক বিপজ্জনক লক্ষণ। ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ঠিক কবে থেকে, তা নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারছেন না। তবে অন্তত ৮-১০ হাজার বছর আগে তো বটেই। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বিশ্বের প্রাচীনতম কৃষিক্ষেত্রের নিদর্শন মিলেছে যব, ধান ও গমের সন্ধানও। বৈদিক যুগে এদেশে যে চাল-গম ইত্যাদি হতো তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে যবের উৎপাদন অনেক বেশি ছিল বলে মনে হয়। যিশুখ্রিস্টের জন্মের ৮ হাজার বছর আগেই এদেশের মানুষ যবের ব্যবহার শিখেছিল বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদের যুগে এখানকার মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল যব। বেদ থেকে আমরা একটা ঘটনার কথা জানতে পারছি— দেবরাজ ইন্দ্রর পুত্র বসুক্ত'র বাড়িতে একটা যজ্ঞানুষ্ঠান হচ্ছে। কিন্তু দেবরাজ উপস্থিত হতে পারছেন না বলে ইন্দ্রর পুত্রবধূর মন খারাপ। আক্ষেপ করে স্বামীকে বলছেন, আহা! যদি আসতেন, কী ভালোই না হতো। যব ভাজা এবং আরও কত ভালো ভালো খাবারই না খেয়ে যেতে পারতেন (ঋগ্বেদ ১০, ২৮, ১-৩)। এ থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে সেই প্রাচীনকাল থেকে এদেশে গবাদি পশুও পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছিল। এবং উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল কেবল জৈব তথা প্রাকৃতিক কৃষি। প্রকৃতির নিয়মানুসারে দিনে দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যশস্যে সেইভাবে কখনো টান পড়েনি। দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাদি যেটুকু যা ঘটেছে তা ছিল কুচক্রীদের রাজনৈতিক ফন্দিপ্রসূত। চীনদেশেও অনেক দিন আগে থেকে জৈব কৃষি চলে এসেছে। চীনে বিপুল পরিমাণে জনসংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সেদেশে খাদ্যাভাবে মহামারি দেখা দিয়েছে খুব কম। দু' দশক আগেও খবর ছিল চীনে অন্তত ২ কোটি গোবর গ্যাসের প্ল্যান্ট চালু রয়েছে। যাতে গোরু-মোষের গোবর ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্যাস বার করে নেবার পর সেইসব গোবর নিয়ে গিয়ে ফেলা হচ্ছে জৈব সার তৈরি করার 'পিট'-এ। সেই সার ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষিক্ষেতগুলোতে।

সবদিক পর্যালোচনা করে মাতৃভূমির উর্বরতা রক্ষা এবং কীটনাশক বর্জিত সুষম খাদ্যশস্য, আনাজপাতি, ফলমূল উৎপাদনের জন্যই মোদী সরকার জৈব কৃষির ওপর এত বেশি জোর দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন তো দীর্ঘদিন ধরেই মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষার জন্য জৈব কৃষির ওপর স্থিত থাকার কথা বলে আসছে। নানা সমালোচনা, কটূক্তি উপেক্ষা করেও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে দেশের মাটির সর্বনাশ ঘটানোর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করে চলেছে। এসবের মধ্যে যারা রাজনীতির গন্ধ খুঁজছেন,

পশ্চাদ্‌গামিতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখছেন, তাঁদের করুণা করা ছাড়া উপায় নেই।

কারণ, তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক প্রগতি'র ধ্বজাধারীদের সম্ভবত এই ধারণা স্পষ্ট নয় যে কলকারখানা থেকে নির্গত হওয়া কার্বন-ডাই- অক্সাইড ছাড়াও জীবাশ্মজাত রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণেও প্রকৃতি-পরিবেশে এই ক্ষতিকর গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ফলে চাল-গমের মতো প্রধান খাদ্যশস্যে ৫ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায় আয়রন, জিংক ইত্যাদির পরিমাণ। আয়রন যেমন রক্ত বৃদ্ধির সহায়ক, জিংক সহায়ক হয় রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বা ইমিউনিটি পাওয়ার বৃদ্ধিতে। এ দুটো কম হলে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদেরও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। আমাদের দেশে এখনই অন্তত ২০ কোটি মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন বলে এক পরিসংখ্যানে জানিয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএইচ চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেল্‌থ'-এর মুখ্য গবেষক-বিজ্ঞানী স্যামুয়েল মেয়ার্স।

সাম্প্রতিককালে নিজেদের 'বিজ্ঞানমনস্ক' বলে জাহির করা এক শ্রেণীর লোকেদের তরফে বড়ো গলায় জিনগত উচ্চ ফলনশীল কৃষির পক্ষে ঢালাও প্রচার চালানো হচ্ছে। ইংরেজিতে ফলাও করে বলা হচ্ছে 'Green revolution on genetically modified agriculture' বলে। এই জিনগত 'সুবজ বিপ্লব' কৃষিপদ্ধতির মূলে রয়েছে রাসায়নিক সার। যা তৈরি হয়ে থাকে অতিরিক্ত বেশি তাপমাত্রায় পোড়ানো জীবাশ্ম জ্বালানি (burning fosil fuel) বা পেট্রোলিয়াম থেকে। যথা ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এক কিলোগ্রাম ইউরিয়ার জন্য দরকার হয় ২ লিটার ডিজেল। সোজা কথায়, এক কুইন্টাল ইউরিয়া বানাতে ২০০ লিটার ডিজেল পোড়াতে হয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মতো মারণ গ্যাস ছড়িয়ে পড়া। বিশ্বজুড়ে জিনগত কৃষির ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ইউরিয়ার জন্য বিপুল পরিমাণে ডিজেল পোড়ানোর ফলে সারা বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে কী পরিমাণে বিষাক্ত CO_2 বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়তে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অথচ কোনেও বিকল্প নেই এমন নয়। আমাদের দেশের কৃষকরা পরম্পরাগত ভাবেই জানেন কীভাবে গোবরের সঙ্গে গাছগাছালি, লতাপাতা, আনাজপাতি এবং ফলমূলের ছালবাকল, ফুল-পাতাসহ নানা ধরনের পূজার উপাচার, সর্ষের খইল ইত্যাদি প্রায় পরিত্যক্ত জিনিস মিশিয়ে এবং তার পচন ঘটিয়ে শক্তিশালী জৈবসার তৈরি করা যায়। নানা ধরনের পরিসংখ্যানের হিসাব হয়তো সবার জানা নেই। কিন্তু এদেশের সাধারণ কৃষকরাও জানেন যে জৈব বা কম্পোস্ট সার ব্যবহার করলে জমিতে ঘন ঘন জল দিতে হয় না। বৈজ্ঞানিক তথ্য বলছে কোনো জমিতে জৈব তথা প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করা হলে সেই জমির জল ধারণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। প্রতি হেক্টরে সেই জলের পরিমাণ হলো ৮০ হাজার লিটার।

বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত মাত্রায় কার্বন নিঃসরণের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন যখন মারাত্মক বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং তা থেকে নিস্তার পাবার জন্য বিশ্বের সমস্ত নেতা যখন 'বসুন্ধরা' সম্মেলন করে কার্বন নির্গমনের হার কমানোর উপায় খুঁজতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন, তখন ভারতের প্রাচীন পরম্পরাগত এবং এখন প্রায় অবহেলিত জৈব কৃষিকে নতুন উদ্যমে পুনর্বহাল করা যে নিতান্ত জরুরি তা আলাদা করে বার বার বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিবেশ দূষণের ফলে বিশ্বজুড়ে কী ধরনের প্রলয়ঙ্কারী প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে তা সবাই দেখতে এবং অনুভব করতে পারছেন। এর ওপর কৃষির মাধ্যমে তা যাতে আর তিলমাত্রও বাড়তে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশ্বের মোট স্থলভূমি বা ল্যান্ড মাস-এর প্রায় ৬০ শতাংশই হলো কৃষিজমি (বনভূমি-সহ)। যেখানে কম-বেশি চাষবাস হয়ে থাকে। জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে যার বিশাল ভূমিকা রয়েছে। বলা বাহুল্য, এঁচোড় গায়ের জোরে পিটিয়ে নরম করা যেতে পারে কিন্তু কাঁঠাল বানানো যায় না। এটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তেমনি জীবাশ্ম জ্বালানিজাত সার প্রয়োগ করে সাময়িকভাবে ফসলের পরিমাণ হয়তো সামান্য কিছুটা বাড়ানো যেতে পারে কিন্তু তার গুণবত্তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। এটাও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাছাড়া রাসায়নিক সার ব্যবহারে অর্থনীতিতেও ধাক্কা খায়। এখনই সারা বিশ্বে এই সার প্রয়োগের জন্য অন্তত ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হচ্ছে।

এছাড়াও এই সারে উৎপাদিত ফসল ব্যবহারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় নানা ধরনের দুরারোগ্য (chronic) ব্যাধি বাসা বাঁধছে বলেও জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এক কথায় রাসায়নিক সার হলো মন্থর বিষ। মানুষকে ধীরে ধীরে শারীরিক ও মানসিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্যান্ন গ্রহণ করা হয়, সেই খাদ্যান্নই বেঁচে থাকার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাসায়নিক সারের কারণে। তবে কিছুটা হলেও স্বস্তির কথা এই যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের একাংশ এখন জৈব কৃষির ফসল ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। বাজারে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতারা 'দিশি' পটোল, 'দিশি' কলা, 'দিশি' পালং ইত্যাদি কথা বলেছেন এবং কেনা-বেচাও করছেন। এমনকী 'দিশি' হাঁস, 'দিশি' মুরগি-ও শোনা যাচ্ছে। এই 'দিশি' শব্দটা আসলে প্রাকৃতিক তথা জৈব-র দ্যোতক। এর ব্যাপক ও সামগ্রিক পুনঃপ্রচলন হওয়া প্রয়োজন। তাতে বাকি সমস্ত কিছুর সঙ্গে রক্ষিত হবে ভারতের পরম্পরাগত সংস্কৃতিও। সারা বিশ্ব জানবে ভারতের প্রাচীন কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষকরা যে অবদান রেখে গেছেন, আজ এবং ভবিষ্যতেও তার কোনো বিকল্প নেই। প্রাচীন ভারত যে শ্রেষ্ঠ ভারত ছিল এবং প্রাচীন ভারত ভবিষ্যৎ বিশ্বকে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার দিয়ে গেছে সেই ভাণ্ডার থেকে চয়ন করাটা যে প্রতিক্রিয়াশীলতা নয় বরং বিকাশশীলতা তার 'পুনর্মূল্যায়ন এখন সত্যিই জরুরি। ভূমি তথা মাতৃভূমি রক্ষা পেলে তবেই যে তার সন্তানসন্ততি --- মনুষ্যকুল, প্রাণীকুল সকলেই রক্ষা পাবে, এনিয়ে দ্বিমতের কোনও জায়গা নেই। জৈবকৃষি বিষয়ে মোদী সরকারের এই বৈপ্লবিক উদ্যোগকে তাই সাধুবাদ জানাতেই হবে। □

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয় জাগরণ

ঊষা পর্ব (৬৩৬ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ)

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর পরাক্রম দ্বারা গুরু চাণক্যের নির্দেশিত পথে প্রাচীন ভারতে যে অগ্নিদীপ্ত বীর্যগাথা ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার জন্ম দিয়েছিলেন তাই ছিল ভবিষ্যৎ সার্বভৌম শক্তিশালী ভারত রাষ্ট্রের রূপরেখা। এই ভারত রাষ্ট্রই একদিন স্বাভিমানী, বৈভবশালী, আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ হয়ে বিশ্বের শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে সক্ষম হবে।

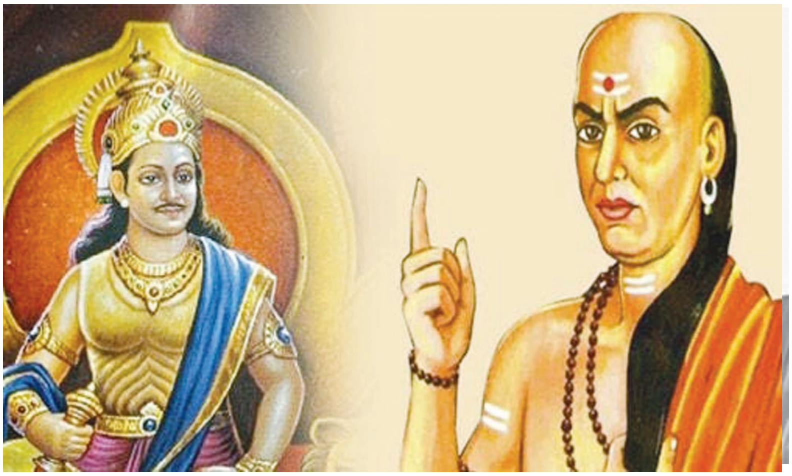

বহিরাগত গ্রিকদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করে যে বিশাল সাম্রাজ্য চন্দ্রগুপ্ত নির্মাণ করে গিয়েছিলেন তার প্রায় দীর্ঘ হাজার বছর আর কোনো বিদেশি শক্তি তেমনভাবে ভারতের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। আলেকজান্ডারের পর একাধিক বিদেশি আক্রমণের পর ৭১২ খ্রিস্টাব্দে বিন কাশেমের কাছে রাজা দাহির পরাজিত হন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন দাহির বীর হওয়া সত্ত্বেও পরাজিত হন, কারণ কিছু বৌদ্ধ কাশেমের বিরুদ্ধে যাননি এবং দাহিরের সৈন্যবাহিনীতে কিছু আরবীয় সৈন্য ছিল, তাঁরা কাশেমের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করেনি। ফলে ভারতবর্ষে বিদেশি আরবীয় শাসনের সূত্রপাত ঘটে গেল। এই বিদেশি শক্তির আগমন খুব সহজ ছিল না, যা ভারতীয় ইতিহাসে তেমনভাবে আলোচিত হয়নি বা বলা ভালো স্বাধীন ভারতে যাঁদের উপর ভারতীয় ইতিহাস রচনার ভার দেওয়া হলো সেই মেকলে ভাবধারা জাত রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিবরা লিখলেন না। আরবীয় আক্রমণে যখন এশিয়ার এক বড়ো অংশ, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অংশ বিধ্বস্ত, তখনও কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রবাদী রাজারা তাদের শৌর্যের দ্বারা বিদেশি শত্রুদের পরাভূত করেছিলেন। এইসব কথা ইতিহাস পাঠ্য বইতে নেই।

ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে আরবীয় সংস্কৃতিতে মুড়ে দিতে প্রথম আক্রমণ হয় ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ সে সময় খলিফা ছিলেন উমর (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি:)। কিন্তু তা ব্যর্থ হয় ভারতীয় রাজাদের পরাক্রমের জন্য। পরবর্তীকালে খলিফা ওসমান (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি:) থেকে খলিফা মুয়াউইয়া (৬৬১-৬৮০ খ্রি:)-র সময়কালের মধ্যে মোট ছ'বার ভারত আক্রমণ করে এই আরবরা, আর প্রতিবারই ভারতের বীর রাজারা তা খুব সহজেই প্রতিহত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ৬৬২ খ্রি: যে আরব আক্রমণকারীরা ভারত (সিন্ধু প্রদেশের খোরাসন অঞ্চল) আক্রমণ করে তাদের নেতা-সহ প্রায় সকলেই ভারতীয় রাজাদের কাছে নিহত হয়। এই সব বীরদীপ্ত কাহিনি কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কাছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কারণেই তুলে ধরা হয় না, যা রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রবন্ধে খেদোক্তি সুরেই বলেছেন— 'আমরা ভারতবর্ষের আগাছা পরাগাছা নহি; বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মর স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুক বর্গই যেন সব।' স্বামী বিবেকানন্দও বলেছিলেন— আমাদের এমন ইতিহাস পড়তে হয় যাতে মনে হয় আমাদের বাপ ঠাকুরদারা গর্দভ ছিলেন।

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ভারতের মাটিতে প্রথম বিদেশি আক্রমণ ঘটে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে। ইরাকের খলিফা তার ভ্রাতুষ্পুত্র তথা জামাতা বিন কাশেমকে ভারত আক্রমণে প্রেরণ করে দখল করে সিন্ধু ও মূলতান। তৎকালীন সিন্ধুরাজ দাহির পরাজিত হন যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরেও কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়, মধ্যভারতের যশোধর্মণ, প্রতিহার রাজারা, দক্ষিণ ভারতের চালুক্য রাজারা বার বার যুদ্ধ করে বিদেশি শক্তিকে প্রতিহত করেছিলেন নিজেদের শৌর্যের দ্বারা। ৭১৩ খ্রিস্টাব্দ সিন্ধু ও মূলতানে আরব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও প্রায় তিনশো বছর ওই বিদেশি শাসন শুধুমাত্র ওই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের

নখ-দন্ত ভারতের অন্যান্য স্থানকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারেনি। এই ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয়। অন্যান্য ভারতীয় রাজারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সদাসর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, আর তা সম্ভব হয়েছিল রাজারা বীরত্বের সঙ্গে নিজেদের আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম ছিলেন বলেই। চালুক্য রাজাদের ধর্ম ও যাগযজ্ঞের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তাঁরা ধর্মসহিষ্ণু ছিলেন এতটাই যে, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে অগ্নি উপাসক পারসিকদের রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের বসবাস ও মন্দির নির্মাণে অনুমতি দেন। এর ফলে চালুক্য সাম্রাজ্যে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়েছিল। রাজারা নিজেদের রাজ্যকে শুধুমাত্র ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ একটি স্থান বলেই ভাবেননি, তাঁরা নিজেদের রাজ্যকে জন্মভূমি, মাতৃভূমি, দেবভূমি তথা জননী বলে হৃদয়ের গভীরে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান দিয়েছিলেন।

কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরির কাছে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয় ছিল মর্মান্তিক। তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বীরাজের কাছে মহম্মদ ঘোরি পরাজিত হলেও পৃথ্বীরাজের কিছু ভুলের জন্য, যেমন পরাজিত ঘোরিকে পালিয়ে যেতে দেওয়া, পশ্চিম পঞ্জাব থেকে তুর্কি সেনাদের বিতারণ না করা প্রভৃতি কারণে পবিত্র দেবভূমি ভারতের মাটিতে শিকড় ছড়াতে শুরু করে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ। শুরু হলো 'দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ' ঢালার, 'শান্তিময় পল্লী যত' ছারখার করার পালা, আর শুরু হলো 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ'। এই ধারা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। একটা ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরলেই বোঝা যাবে শান্তস্নিগ্ধ স্নেহরসসিক্ত ভারতের পল্লী, তপোবনগুলোর কী দুর্বিষহ অবস্থা হলো। মহম্মদ ঘুরি কনৌজ অধিকারের পর বারাণসীর দিকে অগ্রসর হয়ে তা জয় করে। এবার শুধু ভূমি জয় করেই ঘোরি ক্ষান্ত থাকল না, হিন্দুদের প্রায় হাজার মন্দির ধ্বংস, ধনরত্ন লুণ্ঠন করল।

৭১২-১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ : পানিপথের প্রথম যুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে ক্রমান্বয়ে মামলুক (দাস), খলজি, তুঘলক, লোদি, ইলায়াস শাহি প্রভৃতি শাসকরা শাসন করে। এই সময়ে ভারতবর্ষ যেন নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিল। একদিকে ধর্মীয় ভাবনা— সকল মানুষই সমান, মহাকাব্যের শাসন পরিচালনার অত্যধিক ব্যবহার (নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না, ক্ষমা প্রার্থীকে ক্ষমার গুরুত্ব অনুধাবন না করেই ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতি), রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব (সঠিক শত্রুকে না চেনা) ইত্যাদি কারণে ভারতীয় রাজাদের দুর্বলতা প্রকাশ পেলে বিদেশি সভ্যতা সনাতনী ভারতবর্ষকে সুদীর্ঘ গভীর অন্ধকারে নিয়ে যায়। এই সময় প্রতিপদক্ষেপে প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষে ভারতবাসী যেন কেউ নয়, যারা ভারতবর্ষের আকাশ বাতাসকে মজহবি উন্মাদে সর্বদা শঙ্কিত করে রাখতো যেন তারাই সব। এ প্রসঙ্গে হাসান নিজামি ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিনের গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ ও জয়ের তাণ্ডবলীলার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, তাঁর 'সেনারা সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হলো এবং এক লক্ষ কাফের হিন্দুদের তৎক্ষণাৎ নরকের আগুনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মূর্তি পূজার সমস্ত কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করল' নিজেদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলো (সূত্র : ইলিয়ট ও ডর্সন, ২য় খণ্ড, পৃ.-২১৫)।

ভারতীয়দের উপর এই সন্ত্রাসের ধারা চলতে থাকলো। সকলে ভীত সন্ত্রস্ত, কোনো এককেন্দ্রিক রাজকীয় শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পেল না, তাই তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না। বিদেশিদের গগনভেদী আল্লাহু আকবর মজহবি হুংকারে ভারতবর্ষ কোথায় যেন নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকলো। কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষের নিজস্ব আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক সমতা বিনষ্ট হলো না। একটি ছোট্ট বীজের মধ্যে যে বিরাট বটবৃক্ষ বিদ্যমান থাকে— যা সকলকে ছায়া দান করে, শীতল হাওয়া দান করে, ঠিক তেমনি ভাবে সেই যুগে কাশী, নবদ্বীপ-সহ বিভিন্ন মঠ এবং ভক্তি আন্দোলন ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিল। ইতিহাস সচেতন রবীন্দ্রনাথ ঠিক বলেছেন— 'বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনও ছিল, নাহলে এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি ও আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী ও নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবন স্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।'

আর এই না পাওয়ার আসল কারণ দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি দূর করে দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে শাসনকার্য যাঁরা ছলনার দ্বারা, মিথ্যাচারের দ্বারা গ্রহণ করলেন, তাঁরা ধর্মীয় দিক থেকে সংকর প্রজাতির, শিক্ষায়-দীক্ষায় মেকলে প্রোডাক্ট, ভারতীয়ত্বের কোনো বালাই ছিল না তাদের। ফলে ছেলে-মেয়েদের আজ যে ইতিহাস পড়তে হচ্ছে তা আত্মবিনাশী শিক্ষা। অথচ তাঁরা জানতেন না যে, আমেরিকান চিন্তাবিদ উইল ডুরান্ট তাঁর গ্রন্থ History of civilization-এ দ্বিধাহীন ভাবে উল্লেখ করেছেন--- 'ভারতবর্ষ সমগ্র মানবজাতির মাতৃভূমি এবং সংস্কৃত হলো সমস্ত ইউরোপীয় ভাষার জননী। ভারত আমাদের দর্শন শাস্ত্রের মাতা, আরবদের মাধ্যমে ভারত আমাদের গণিত শাস্ত্রের মাতা, বুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারত খ্রিস্ট ধর্মের মূল তত্ত্বের মাতা এবং পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে ভারত আমাদের গণতন্ত্র ও স্বশাসনের মাতা'। খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রচিত— 'আর্য সভ্যতার সন্ধানে' বইয়ের বইয়ের পৃষ্ঠা-৭০-এ এই বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। এহেন ভারতবর্ষকে কোথায় যেন কোন গভীর জমাট অন্ধকারে নিয়ে গেল ওই বিদেশি শাসকের দল। সে সময় কোনো রাজশক্তি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু নিমাই, রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক প্রমুখ ভক্তি আন্দোলনের মহাত্মারা তাঁদের আধ্যাত্মিক ভাবনার দ্বারা হিন্দুধর্ম ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার নতুন দিশা দিলেন যা তৎকালীন ভারতকে নবরূপে রূপদান করে। □

বুনিয়াদপুরে সঙ্ঘকাজের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্মেলন

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে সঙ্ঘকাজের চল্লিশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বুনিয়াদপুর সারদা শিশুমন্দিরের সভাগৃহে। ১৯৮৩ সালের মে মাসে বুনিয়াদপুরে প্রথম শাখা শুরু হয়। তারপর বংশীহারী খণ্ডে একটি শাখা থেকে বাইশটি শাখা এবং বহু গ্রামে মিলন ও মণ্ডলী শুরু হয়। পাশাপাশি বিবিধ সংগঠনের কাজও শুরু হয়। বিশেষ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিদ্যা ভারতী ও বিজেপি। এদিনের সম্মেলনে বুনিয়াদপুর ছাড়াও ১৩টি শাখাস্থান থেকে কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ থেকেও কয়েকজন কার্যকর্তা অংশ নেন। বিগত ৪০ বছরে যেসব কার্যকর্তা পরলোকগমন করেছেন যেমন দক্ষ মহন্ত, দ্বিজেন সরকার, তপন দাস, সুকুমার রায়চৌধুরী, মৃণাল মণ্ডল প্রমুখের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও স্মৃতিচারণ করা হয়। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সম্মান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে তৎকালীন জেলা প্রচারক প্রদীপ কুমার দে, বর্তমান ক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য গোবিন্দ ঘোষ। তাঁরা আগামীদিনের জন্য পথনির্দেশ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিলচন্দ্র রায়, দিনাজপুর বিভাগ প্রচারক সন্দীপ সামন্ত, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের মুখ্য মার্গ প্রমুখ গৌতম মণ্ডল। সম্মেলনের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার। তিনি সম্মেলনের উদ্দেশ্য সবার সামনে তুলে ধরেন। কার্যক্রম সঞ্চালনা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সহ সম্পাদক এবং সম্মেলনের সহ সংযোজক কমল সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্মেলনের সংযোজক প্রদীপ কর্মকার। সঙ্ঘের প্রার্থনান্তে পঙ্‌ক্তি ভোজনের পর সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তরবঙ্গ প্রান্তের মার্গদর্শক মণ্ডলের বৈঠক

গত ৩০ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তরবঙ্গ প্রান্তের মার্গদর্শক মণ্ডলের বৈঠক সম্পন্ন হয় শিলিগুড়ির প্রণামী মন্দির আশ্রমের সভাকক্ষে।

উত্তরবঙ্গে সমস্ত জেলা থেকে ধর্মাচার্য ও ধর্মীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বারাণসীর ব্রহ্মনিবাস মঠের সন্ন্যাসী তথা কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলের সদস্য শ্রীদণ্ডিস্বামী জিতেন্দ্র সরস্বতীজী, কেন্দ্রীয় সম্পাদক তথা অখিল ভারতীয় ধর্মাচার্য সম্পর্ক প্রমুখ অশোক তিওয়ারীজী। স্থানীয় সমস্ত মঠ-মন্দির যেমন ইস্কন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, গৌড়ীয় মঠ, গুরুদ্বার গুরু নানক পরম্পরা, জৈন পরম্পরা, জয় জগদ্বন্ধু পরম্পরা, আনন্দমার্গ আশ্রম, জনজাতি পরম্পরার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত সভাপতি নারায়ণ মণ্ডল, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনুপ মণ্ডল, গোরক্ষা প্রমুখ শ্যামনারায়ণ পাণ্ডে, জেলা সচিব রাকেশ আগরওয়ালা এবং মাতৃশক্তি ও যুবা কার্যকর্তা।

সিউড়ি বৃদ্ধাবাসে শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ৩ ডিসেম্বর সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধার উদ্যোগে সিউড়ি বড় বাগানস্থিত বৃদ্ধাবাস হ্যাপি হোমে তিনজন মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিনজন মা যথাক্রমে শ্রীমত্যা শীলারানি ব্যানার্জি, বয়স ৮৭ বছর। তিনি মল্লারপুরে থাকার সময় সেবিকা সমিতির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং জরুরি অবস্থার সময় বহু স্বয়ংসেবককে সহযোগিতা করেছেন। দ্বিতীয়জন তাঁর ছোটো বোন শ্রীমত্যা নীলা চ্যাটার্জি, বয়স ৮৩ বছর এবং তৃতীয় জন শ্রীমতী বাণী মুখার্জি, বছস ৮৫ বছর। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন সন্ন্যাসী স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। তিন মাকে নামাবলী, পরিধেয় বস্ত্র, ফলের ডালা, মিষ্টান্ন ও গীতা শ্রদ্ধার্ঘ্য রূপে প্রদান করেন মাতৃ অনুভবীরা। মাল্যদান করেন তৃপ্তি মুখার্জি, অসীমা মুখার্জি ও কল্পনা বিষ্ণু। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখার্জি ও বিশিষ্ট গায়ক সুব্রত নন্দন। বক্তৃতা দেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বৃদ্ধাশ্রমের পক্ষে ভাষণ দেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা অবসরপ্রাপ্ত স্টেট ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার পুলক সিনহা। সমাপ্তি ভাষণ রাখেন সিউড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু কলকাতায় লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠ এবং ২০২৪-এর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের শুভ উদ্বোধনের সূচনা দেন।

অনুষ্ঠানে ৫২ জন অনুভবী ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শ্রীমতী চৈতালি মিশ্র।

হাওড়ার উলুবেড়িয়া শ্রীরামমন্দিরে অক্ষত কলসপূজন অনুষ্ঠান

গত ৯ ডিসেম্বর হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়া নগরে শ্রীরাম মন্দিরে অযোধ্যা থেকে আগত প্রসাদী চাল (অক্ষত) পূর্ণ কলস পূজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। পূজিত কলসগুলি ১৫টি খণ্ড এবং এবং ১টি নগরে নিয়ে যাবার জন্য প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ঊষানাথ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পর্ক প্রমুখ তথা জেলা পরিবার সম্পর্ক মহা অভিযান টোলি প্রমুখ সব্যসাচী নস্কর, জেলা সঙ্ঘচালক রুধিররঞ্জন নায়েক, জেলা কার্যবাহ চিত্তরঞ্জন মান্না এবং প্রান্ত কার্যকর্তা জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি তাপস ভট্টাচার্য, পরিবার সম্পর্ক মহাভিযান প্রাপ্ত কার্যালয় প্রমুখ রতন চক্রবর্তী। জেলার অন্য কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাগৃহে শিক্ষক সঙ্ঘের কার্যশালা

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৬,২৭ নভেম্বর কলকাতার বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাকক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষার সাংগঠনিক কার্যপদ্ধতি ও বিচারধারা বিষয়ে কার্যশালার আয়োজন করা হয়। কার্যশালায় রাজ্যের ২০টি জেলা থেকে ১০২ জন শিক্ষক কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নারায়ণলাল গুপ্তা, বিশিষ্ট শিক্ষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সাধন পাল, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এশিয়ান স্টাডিজের ডিরেক্টর ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ এবং সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী। কার্যশালার এক ফাঁকে সংগঠনের পক্ষ থেকে 'গুরুবন্দন মনুষ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও আগামী ১৫ ডিসেম্বর শিক্ষক সমাবেশ উপলক্ষ্যে 'বিকাশ ভবন চলো' পোস্টারের উদ্বোধন করা হয়।

দুদিনের এই কার্যশালায় উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক।

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্ত বৈধ : সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১১ ডিসেম্বর, জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ ক্ষমতা (স্পেশাল স্ট্যাটাস) দানকারী ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গৃহীত, ভারতের সংসদে প্রণীত ও রাষ্ট্রপতি অনুমোদিত সিদ্ধান্ত বৈধ বলে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন (বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কউল, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বি.আর. গাভাই ও বিচারপতি সূর্যকান্ত) পাঁচ জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। এ দিনের রায় নিয়ে ঐকমত্য হয়েছেন সাংবিধানিক বেঞ্চের পাঁচ জন বিচারপতিই। রায়দান করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড় স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করছে না শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের জন্য সংবিধানের ৩৫(এ) ধারা বাতিলের সিদ্ধান্তও বহাল থাকলো বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সাংবিধানিক বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে গোটা দেশের জন্য যে সাংবিধানিক

আইন রয়েছে, তা জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কারণ ভারতে অন্তর্ভুক্তির পর জম্মু-কাশ্মীরের আর নিজস্ব কোনো সার্বভৌমত্ব নেই বলে মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়।

প্রধান বিচারপতি রায়দান করতে গিয়ে আরও মন্তব্য করেন, সুষ্ঠু ভাবে জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির উদ্দেশ্যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে ৩৭০ অনুচ্ছেদটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন ও অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর করা হয়েছিল। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের অধিকারও রয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের যে পৃথক সংবিধান ছিল, তার প্রস্তাবগুলি মানার কোনো বাধ্যবাধকতা ভারতের রাষ্ট্রপতির ছিল না বলেও মত দিয়েছে সাংবিধানিক বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫(এ) অনুচ্ছেদ বাতিল ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ওই বছর ৩১ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। গত ২ জুলাই থেকে এই মামলার লাগাতার শুনানি চলে। মামলাকারীদের যুক্তি ছিল, জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভাকে উপেক্ষা করে একতরফা ভাবে এই বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা বাতিল করতে পারে না কেন্দ্র। শুনানির সময় বিচারপতিদের একাধিক কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় আইনজীবীকে। শীর্ষ আদালতে শুনানি চলাকালীন কেন্দ্র দাবি করে, আইনি পদ্ধতি প্রয়োগেই জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ তকমা বাতিল করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের উন্নয়নে গতি এসেছে বলে জানায় কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিশেষ তকমার জন্য শিক্ষার অধিকার-সহ সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার থেকে কাশ্মীরের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছিল বলেও সর্বোচ্চ আদালতে জানায় কেন্দ্রীয় সরকার। সেপ্টেম্বরে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ রায় স্থগিত রাখার কথা জানান।

১১ ডিসেম্বর আদালত তার রায়ে জানায়, জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য ভালো ছিল। সাংবিধানিক এক্তিয়ারের মধ্যে থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ফলে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল অসাংবিধানিক নয়। তাই ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। একই সঙ্গে উপত্যকাকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার কথাও শীর্ষ আদালত তার নির্দেশে জানিয়েছে। ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপত্যকার বিধানসভা ভোট সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অযোধ্যা শ্রীরামমন্দিরের প্রধান অর্চক নির্বাচিত হলেন মোহিত পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে নির্মিত শ্রীরামমন্দিরে পৌরহিত্যের কাজে অর্চক-পুরোহিত পদে ৩০০০ জনেরও বেশি আবেদনকারীর মধ্যে শীর্ষ স্থানাধিকারী হলেন মোহিত পাণ্ডে। গাজিয়াবাদ নিবাসী মোহিত— দুধেশ্বর বেদ বিদ্যাপীঠে ৭ বছর অধ্যয়নের পর তিরুপতি গিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। ৩০০০ জনেরও বেশি আবেদনকারীর ইন্টারভিউয়ের পর শ্রীরামমন্দিরের অর্চক-পুরোহিত পদে ৫০ জন নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তরুণ ছাত্র মোহিত প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ৬ মাসের প্রশিক্ষণ লাভের পর নির্বাচিতরা সংশ্লিষ্ট পদে নিযুক্ত হবেন।